প্রাক্তনী

PRAKTONI

CALCUTTA UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION OF GREATER WASHINGTON DC

Acknowledgement

We express our appreciation and gratitude to the following patrons for their generous donation towards publishing *Praktoni* and supporting the cultural events of our reunion.

Basu, Jayasree and Sankar

Bera, Jayati and Tapan

Bhar, Sikha and Tarak

Biswas, Roopa and Dhrubajyoti

Chatterjee, Disha and Sabarni

Chatterjee, Pramita and Debkumar

Chattoraj, Sruti and Dhruba

Choudhuri, Rajani and Supratim

Das, Gokul

Dasgupta, Nandita and Utpal

Datta, Gayatri and Atin

Dewanjee, Urmila and Mrinal

Dutta, Sanghamitra and Amitava

Ganguly, Ashoke

Ghosh, Arunima and Banerjee, Jashoman

Ghosh, Kumkum and Pradip

Guha, Kajal and Arun

Mazumdar, Sati and Mainak

Mondal, Pompa and Arup

Motayed, Saswati and Asok

Mukhopadhyay, Mahua and Suman

Nath, Jayasree and Nitya

Saha, Raka and Bratin

প্রাক্তনী

PRAKTONI
2022

Annual Magazine

Volume 12

Calcutta University Alumni Association of Greater Washington,DC

www.cuaa-dc.org

সম্পাদনা
নন্দিতা দাশগুপ্ত
ধ্রুব চট্টরাজ

প্রচ্ছদ
যশোমান ব্যানার্জী

অভিজ্ঞান নির্মাণ
যশোমান ব্যানার্জী
পর্ণা চট্টরাজ

পরিকল্পনা, বুনন, বিন্যাস ও নির্মাণ
নন্দিতা দাশগুপ্ত

অন্তর্জাল প্রযুক্তি
যশোমান ব্যানার্জী
সুজয় লাহিড়ী

প্রকাশনা
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তনী সংসদ
বৃহত্তর ওয়াশিংটন ডি.সি.

পরিচালক মন্ডলী
ধ্রুব চট্টরাজ
সুমন মুখোপাধ্যায়
পর্ণা চট্টরাজ
শাশ্বতী মোতায়েদ
দীপান্বিতা দত্ত

উপদেষ্টা পরিষদ
অপর্ণা প্রধান
বিধানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
দিলীপ সোম
নন্দিতা দাশগুপ্ত
তপন বেরা
তারক ভড়

নির্বাচন কর্মসমিতি
দেবকুমার চট্টোপাধ্যায়
শঙ্কর বসু

মুদ্রণ
Premiere Printing Company
www.premiereprinting.com

সূচীপত্র

রচনাকার	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
Dhruba K. Chattoraj	From the President's Desk	8
ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছর ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় **75 Years of India's Independence and Calcutta University**		
শ্যামল চক্রবর্তী	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়: অধীনতার ও স্বাধীনতার খণ্ডচিত্র	৬-১০
Sumitra Mitra Reddy	Songs, Literature, Art, Drama, Bombs, Guns, Protests, Money, and Inspiration: The Weapons of the Freedom Fighters	১১-১৫
ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছর **75 Years of India's Independence**		
Arun Kumar Guha	What You Owe the Country You Left Behind	১৭-১৯
ভারতী মিত্র	হীরা	২০-২৮
Mainak Majumdar	Personal Reminiscences of a Tragic Period: August 1946 – August 1947 in Kolkata	২৯-৩২
Sankar P. Basu	Contributions by Two Foreign Nationals Toward Indian Educational System and Independence Movement	৩৩-৩৭
বিবিধ প্রসঙ্গ		
অরুন্ধতী ঘোষ	মহিষাসুরমর্দিনী	৩৯
বিকাশ দাস	চোখের আলোয় দেখেছিলেম	৪০
দেবাঞ্জন বিশ্বাস	চন্দ্রপুলি	৪১-৪২
গোকুল চন্দ্র দাস	কোভিড- ১৯ (COVID-19) অতিমারীঃ আর টি -পিসিআর (RT-PCR) আবিষ্কার এবং করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধে এর মূল্যায়ন	৪৩-৪৯
গোকুল চন্দ্র দাস	হিউস্টনে সত্যজিৎ রায়ের দিনগুলি	৫০-৫২
গৌরীশঙ্কর মুখার্জ্জী	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	৫৩-৫৪
যশোমান ব্যানার্জী	কিছু..	৫৫
যশোমান ব্যানার্জী	ভুলে যাওয়া	৫৫
Jayasree Basu	The Yearning	৫৬
Jayasree Basu	Chapters	৫৬
মৌসুমী মোহারার	ফাগু চা বাগানে এক রাত	৫৭
নমিতা কুণ্ড	প্লাবন	৫৮
নমিতা কুণ্ড	স্বামী বিবেকানন্দ	৫৮
নন্দিতা দাশগুপ্ত	আত্মকল্প, যাত্রা	৫৯
Ranjana Khan	A Personal Statement of Geography Dept. Presidency College (CU), Kolkata	৬০
শুক্লা গাঙ্গুলী	অমৃত লোভায়	৬১
সোমনাথ বক্সী	কৃষ্ণজীবন, পটল, এবং স্বনির্ভর গ্রাম	৬২-৬৩
Urmila and Mrinal K. Dewanjee	Could We Live to a 100 and Still Enjoy a Creative Life?	৬৪-৭০

FROM THE PRESIDENT'S DESK

Dear Alumni and Friends:

It is a matter of great pride and joy that we have the 2022 issue of *Praktoni*, thanks to Nandita Dasgupta for her stewardship and hard work. Culture is an inalienable aspect of human existence. We Bengalees believe in it and it has been part of Bengali identity. Publishing *Praktoni* is our humble effort to provide a forum where you can express your latent cultural talents. I think it is the most significant of the activities of CUAA-DC these days. Good ideas come from imagination with no bounds, and to make them useful, they need to be narrowed down to tractable ones (the two stages are metaphorically called "Building castles in the sky" and "Building houses of cards that do not topple over"). We tend to support good ideas in a variety of art forms through *Praktoni* and today's cultural events.

We are even more proud that we were able to publish *Praktoni* online in the middle of pandemic, again thanks to Nandita. We are back to be presenting you with hard copies this year. Covid has migrated to the back of our mind. The indomitable human spirit is now defying all Covid-related restrictions with no major backlash yet and there is an overshoot in social activities world over. CUAA-DC is going with the flow and we are having in-person reunion after a gap of two years.

All is however not well with CUAA-DC. We spent another year without addressing our mission to do something for our Alma Matter. Please use your imagination, and even if it is in stage one, come forward with it so that we can all discuss how to bring the idea to stage two.

For now, on behalf of all the BODs, I thank all of you who made literary contribution to the magazine, helped defray the cost of publication with donation and advertisement, and made this evening an enjoying one with their presence and volunteering.

Dhruba K. Chattoraj
November 2022

ভারতের স্বাধীনতার
৭৫ বৎসর
ও
কলিকাতা
বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়: অধীনতা ও স্বাধীনতার খণ্ডচিত্র

শ্যামল চক্রবর্তী

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে আমরা স্বদেশের স্বাধীনতা হারিয়েছিলাম। ১৮৫৫ সালে ভারতের বুকে সংগঠিত হয় সাঁওতাল বিদ্রোহ। পলাশী যুদ্ধের একশ' বছর পরে ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। যে প্রতিবাদী আন্দোলনকে আমরা বহু দশক ধরে 'সিপাহি বিদ্রোহ' হিসেবে চিহ্নিত করেছি, সে ভাবনার বদল হয়েছে। ঐতিহাসিকেরা মহাফেজখানার দলিল দস্তাবেজ ঘেঁটে তাকে 'মহাবিদ্রোহ' শিরোনামে অভিহিত করেছেন। কেন মহাবিদ্রোহ? দেশের সকল স্তরে সে সময় প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল। ওই বিদ্রোহ শুধুমাত্র কয়েকটি সেনা ছাউনিতে গোটাকয় সিপাহির প্রতিবাদ আন্দোলন ছিল না। মনে পড়ছে আমাদের, ওই সময় দেশের এক উচ্চ ইংরেজ আধিকারিক বলেছিলেন, এ ধরনের বিদ্রোহ যদি বন্ধ করতে হয় তবে দেশের নানা প্রান্তে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়া প্রয়োজন। এ এক অভিনব উপলব্ধি যা উপনিবেশ শাসনকর্তার মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছে। উচ্চশিক্ষা তবে কি শাসক শ্রেণীর 'ভৃত্য' তৈরি করে? ভিন্ন ভাবনায় মানুষ তৈরি করে না? উত্তর যে মিশ্র, সে কথা সকলেই উপলব্ধি করবেন।

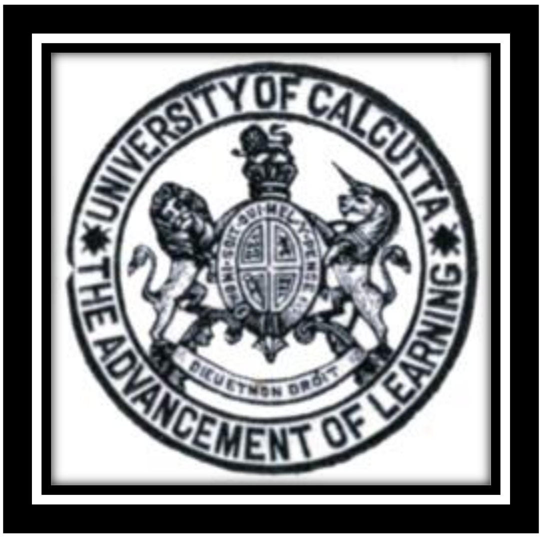

১৮৫৭ সাল 'সিপাহি বিদ্রোহ' বা মহাবিদ্রোহের বছর। ১৮৫৭ সালেই ভারতের তিন প্রেসিডেন্সিতে তৈরি হয় তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়। ২৪ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৮ জুলাই বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়। ৫ সেপ্টেম্বর মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়। এই নাতিদীর্ঘ নিবন্ধে আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বিষয়ে গোটা কয়েক তথ্য আলোচনা করব।

স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রস্তুতি বলতে যা বোঝায় তার শুরু হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কমপক্ষে সাড়ে চার দশক পরে। ১৯০২ সালের ২৪ মার্চ তৈরি হয় অনুশীলন সমিতি। শরীরচর্চার ক্লাব হিসেবে এঁদের আত্মপ্রকাশ। গোপনে তৈরি হচ্ছিলেন বিপ্লবীরা। পথ বেছে নিয়েছিলেন সশস্ত্র আন্দোলনের। প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল দু'জায়গায়। ঢাকা ও কলকাতা। ১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে গড়ে উঠে যুগান্তর পার্টি। অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ একুশ জন বিপ্লবী মিলে এই পার্টি গড়ে তুলেন। সহিংস আন্দোলনের কাজে অস্ত্র সংগ্রহ শুরু করেন। বোমা তৈরির প্রস্তুতি নেন। এঁদের প্রধান কেন্দ্র ছিল ২৭, কানাই ধর লেন, কলকাতা। পরে ৪১, চাপাতলা ফার্স্ট লেন-এ চলে যায়। এই দুটি ঠিকানাই ছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের খুব কাছাকাছি। বিপ্লবীদের কেউ কেউ তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নানা মেসে যাতায়াত করতেন। বিজ্ঞানী জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের অনুজ বিশিষ্ট ভৌত রসায়নবিদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের পালিত অধ্যাপক ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন:

"রাজনীতিতে কোন সময় যোগ দিই নাই, কিন্তু ১১০, কলেজ স্ট্রীটস্থ মেস বাড়ীতে বিপ্লবী নেতাদের খুবই আনাগোনা ছিল এবং আমি তাঁদের বেশ ভাল করেই

জেনেছিলাম। উক্ত মেসের পরিচালক ছিলেন ডা. নীলরতন ধর। আর সেখানে থাকতেন ডক্টর জ্ঞান মুখার্জ্জী, ডক্টর জ্ঞান ঘোষ, ডক্টর নীলরতন ধর। খুবই আসতেন জাতীয় অধ্যাপক শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ বসু---আর প্রায়ই দেখা যেত 'বাঘা যতীন' প্রমুখ বিপ্লবী নেতাদের।''

৩৯ জন 'বিশ্ববিদ্যালয় ফেলো' নিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। ভারতীয় ছ'জন। প্রিন্স গোলাম মহম্মদ, মৌলভি মহম্মদ ওয়াজি, রামগোপাল ঘোষ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ফ্যাকাল্টি বা অনুষদ ছিল চারখানা। কলা, আইন, মেডিসিন ও ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ। পঠন পাঠন বিশ্ববিদ্যালয়ে হত না। পরীক্ষা গ্রহণের প্রতিষ্ঠান ছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। সুকল স্তরে প্রবেশিকা পরীক্ষা, কলেজ স্তরে ইন্টারমিডিয়েট ও স্নাতক স্তরের পরীক্ষা নেওয়া হত। পাঠক্রম তৈরি, পাঠ্যবই নির্বাচন, খাতা দেখা ও ফলাফল ঘোষণা---এই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ। উচ্চশিক্ষায় সরকারি বরাদ্দ কখনও উৎসাহব্যঞ্জক ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রতিনিয়ত অর্থের জন্য সরকারের কাছে চিঠি লিখতে হত। চিঠিগুলির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিজেদের স্বাধিকার ও মর্যাদা বিসর্জন দিতে কখনও রাজি ছিল না। যারা জানেন না, শুনলে অবাক হবেন, ক্যামাক স্ট্রিটের এক ভাড়া বাড়িতে শুরু হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়। কর্মচারী বলতে নিবন্ধক ও একজন করণিক। শুরুতে উপাচার্য হতেন কলকাতা উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারক। সাম্মানিক পদ। আদালতের কাজ সেরে বিকেলবেলা তাঁর শুরু হত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পরিচালনার কাজ। সিন্ডিকেট সভা হত উপাচার্যের বাসভবনে। সেনেট সভা হত কলকাতা টাউন হলে। ১৮৬৩ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি দেওয়া শুরু হয়। ১৮৬৯ সালে উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখার্জির ৫০০০ টাকা অনুদানে বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরির পত্তন হয়। ১৮৫৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছে ২৪৪ জন। ১১৫ জন প্রথম বিভাগ পেয়েছে। একই বছরে বি.এ. পরীক্ষার্থী ১৩ জন। মাত্র ২ জন দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেছে। শুরু থেকে নানা বাধা বিপত্তি বাদ প্রতিবাদ অবজ্ঞা ও সমর্থনকে পাথেয় করে বিশ্ববিদ্যালয় উৎকর্ষ অর্জন করেছিল।

পরাধীন ভারতের বাদ প্রতিবাদের ছবি বিশ্ববিদ্যালয়ের নথিপত্র ঘাঁটলে খুব একটা পাওয়া যায় না। গান্ধীজির আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হবার পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রসংখ্যা বিশাল পরিমাণে কমে যায়। ফি আদায় হয় খুব কম। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখবে কেমন করে, সেই প্রমাদ গুনতে থাকে। অসহযোগ আন্দোলন বা প্রেপ্তারির কথা সরাসরি উল্লিখিত নেই কোথাও। তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার ছবি রয়েছে। ওই সময় থেকে দেখা যায় কারাবন্দি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েছে। তারা প্রবেশিকা বা অন্য কোনো পরীক্ষায় বসার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি চাইছে। ছাত্রদের ও শিক্ষকদের সভা সমিতিতে অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে যখন সরকারি বিজ্ঞপ্তি বেরোল, বোঝাই যাচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের বাইরে সমাজ জীবনে এক প্রবল আলোড়ন প্রবাহিত হচ্ছিল। কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বারবার সরকারি সাবধান বাণী শুনেছে। যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির কথা অবশ্যই বলতে হয়, সেটি হল মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রতিষ্ঠিত ব্রজমোহন ইনস্টিটিউশন। নানা বিষয়ে স্বীকৃতি চাইতে গিয়ে এই প্রতিষ্ঠানকে প্রচুর ভুগতে হয়েছে।

একটি-দুটি উদাহরণে যাওয়া যাক। রিপন কলেজে পড়াতেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের অনুজ অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ছাত্রদের প্রতিবাদে সামিল হতে উৎসাহ দিচ্ছেন, এমন একটা অভিযোগ কলেজে এল। কলেজ তাঁর কাছে জবাব চাইলেন। এমনতরো কাজে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় ভবিষ্যতে অংশ নেবেন না, এমন একটা প্রতিশ্রুতি কলেজ কর্তৃপক্ষ তথা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর কাছে চেয়েছিল। তিনি যে উত্তর দিয়েছিলেন তা চরিত্রে ব্যতিক্রমী। তার অংশ বিশেষ উল্লেখ করছি।

"So far as the demand for an assurance is concerned, I beg to point out that the words

‘such conduct’ are vague and indefinite. If I am to give an undertaking, which will be binding upon my future conduct, I ought to know precisely what ground the undertaking is intended to cover. But notwithstanding this vagueness in the language of the Syndicate I am prepared to say (as I indicated in my statement) that I shall not incite students to take part in active political agitation, nor shall I countenance such agitation on their part. But this undertaking will not prevent me, from taking part in the political meetings of citizens.’’

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের তীব্রতা উপলব্ধি করেছে বিশ্ববিদ্যালয়। নইলে সিন্ডিকেট সভা থেকে নীচের সিদ্ধান্ত নেওয়া হত না।

‘‘It was resolved that a circular be sent to the Heads of affiliated Colleges and recognised High Schools inviting their co-operation in preventing students from attending the Political demonstrations in connection with the Partition of Bengal on the 16th of October.’’

১৯০৯ সালের ৯ অক্টোবর সিন্ডিকেট সভা থেকে উপরের বয়ানের খসড়া তৈরি হয়।

খানিকটা আগে ব্রজমোহন ইনস্টিটিউশনের কথা উল্লিখিত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান শুধু যে পাঠক্রমের স্বীকৃতি লাভে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে তাই নয়, আর্থিক অনুদান থেকেও বঞ্চিত হয়েছে। ‘অপরাধ’ ছিল, সরকারি সার্কুলার মেনে দাসখত লিখে দেয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টে রয়েছে:

‘‘In 1907, the Institution was deprived of the scholarship rights by the Government of Eastern Bengal and Assam as the authorities of the Institution had refused to give an assurance in writing to the effect that the Institution would be conducted strictly in accordance with the principles laid down in the Government of India letter no 332, dated the 4th May, 1907, popularly known as the Risley Circular.....they did not consider that a written assurance was necessary.’’

এই সেই সার্কুলার যা সভা সমিতিতে যোগদান নিষিদ্ধ করেছে।

অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নাগরিক জীবনের দায়বদ্ধতার কথা ভুলে যাননি। টাউন হলের এক সভায় তিনি বক্তৃতা করেন যা শাসকের প্রতি ‘বিদ্বেষমূলক’ মনোভাব প্রকাশ করেছে বলে শাসকশ্রেণী ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উভয়েই মনে করেছে। তাই সিন্ডিকেট নথিবদ্ধ করেছে:

"....is decidedly objectionable and shows him to be a person unfit for the responsible post of a College Professor, who is expected to guide, and has ample opportunities to influence the opinions of the students entrusted to his charge; that hence the Syndicate consider it desirable that Babu Jitendralal Banerjee’s connection with the Ripon College should cease.’’

১৯১১ সালের ২ ফেব্রুয়ারি রিপন কলেজ কাউন্সিল যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তা বিশ্ববিদ্যালয়কে জানিয়ে দেয় ও বিশ্ববিদ্যালয় সরকারকে জানিয়ে দেয়।

"That in accordance with the recommendation of the Syndicate, Professor Jitendralal Banerjee be requested to resign and that in the event of his not resigning in a week’s time his service be dispossessed with.’’

জিতেন্দ্রলাল পদত্যাগপত্র জমা না দেওয়ায় কলেজ বলেছিল ১৯১১ সালের এপ্রিল মাস থেকে তাঁর নাম শিক্ষক তালিকায় থাকবে না। কলেজের এমন 'ধীরগতি' আচরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পছন্দ হয়নি. বিশ্ববিদ্যালয় নির্দেশ পাঠায়, এক মাসের মাইনে দিয়ে তাঁর নাম কলেজ তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হোক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নথিতে যদিও বাইরের বাদ প্রতিবাদের ঢেউয়ের পূর্ণ প্রতিফলন মেলে না, বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ১৯৩২ সালে সমাবর্তন সভায় যা ঘটেছিল তার উল্লেখ বিশ্ববিদ্যালয় বিস্তারিতভাবে নথিবদ্ধ করেছে। তার উল্লেখ না করে বিশ্ববিদ্যালয়ের গত্যন্তর ছিল না কোনো। বিষয়টি আমরা দেখে নিই।

দুই সহোদরা বিপ্লবী কন্যা কল্যাণী দাস ও বীণা দাস। তাঁদের স্বনামধন্য পিতা বেণীমাধব দাস ছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর শিক্ষক। 'ছাত্রী সংঘ' নামে স্বাধীনতাকামী এক নারী সংগঠনের সদস্যা ছিলেন বীণা দাস। ১৯৩২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন সভা শুরু হয়েছে। চ্যান্সেলর হিসেবে স্ট্যানলি জেকসন বক্তৃতা দিতে উঠেছেন। অতর্কিতে বীণা দাস তাঁকে আক্রমণ করেন। পরপর পাঁচখানা গুলি করেছিলেন তিনি। কিন্তু জেকসন বেঁচে যান। বীণা তাঁর এই কাজের স্বপক্ষে দীর্ঘ পাঁচ পৃষ্ঠার বিবৃতি দিয়েছিলেন। বিবৃতির প্রতিটি শব্দ অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনার। সামান্য খানিকটা অংশ উল্লেখ করা যেতে পারে।

"My object was to die, and if to die, to die nobly fighting against this despotic system of Government which has kept my country in perpetual subjection to its infinite shame and endless suffering—and fighting in a way which cannot but tell...is life worth living in an India so subjected to wrong, and continually groaning under the tyranny of a foreign Government, or is it not better to make one's supreme protest against it by offering one's life away? Would not the immolation of a daughter of India and of a son of England awaken India to the sin of its acquiescence to its continued state of subjection and England to the iniquities of its proceedings?''

বিচারে বীণা দাসের ন'বছর কারাদণ্ড হয়েছিল। পাঁচ পৃষ্ঠার এই অনন্য স্বীকারোক্তি প্রচারের উদ্যোগ নিতেই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ নিষেধাজ্ঞা জারি করে। জেল থেকে ১৯৩৯ সালে ছাড়া পেলেও বীণা আন্দোলনের পথ থেকে সরে আসেননি। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। পরে আদর্শগত কারণে কংগ্রেস ছেড়েছেন। মার্কসবাদের প্রতি তাঁর আমৃত্যু অটুট বিশ্বাস ছিল।

৬ ফেব্রুয়ারি সমাবর্তন সভার অব্যবহিত পরে বিশেষ সিন্ডিকেট সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে এক দীর্ঘ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। প্রস্তাবটি আমরা হুবহু পেশ করে এই নিবন্ধের ইতি টানব।

1. That this meeting of the Vice-Chancellor and Syndicate and of Fellows present expresses its profound thankfulness to Providence for the miraculous escape of His Excellency Sir Stanley Jackson, Chancellor of the University, from the dastardly attempt made on his life at to-day's Convocation, while His Excellency was delivering his address, and conveys to His Excellency its warm and respectful congratulations and an expression of its deep admiration for the wonderful courage and coolness shown by His Excellency on the occasion, particularly in continuing the proceedings to a close.
2. That this meeting desires also to offer its congratulations to the Hon'ble Lady

3. Jackson upon His Excellency's escape and expresses its sincere admiration of the serene fortitude with which she stood by and supported His Excellency.
4. That this meeting expresses its deepest horror and abhorrence at the dastardly outrage and records its special sense of grief and humiliation at the fact that the precincts of the University should have been desecrated by the perpetration of such an abominable crime, particularly by one of its girl students.
5. That this meeting reiterates its conviction that such acts of terrorism are opposed to the best traditions of India and constitute a serious menace to the cause of the country's advancement and culture.

Songs, Literature, Art, Drama, Bombs, Guns, Protests, Money, and Inspiration: The Weapons of the Freedom Fighters

"Life without liberty is like a body without spirit." - Kahlil Gibran

Sumitra Mitra Reddy

Songs that became legends

Vande Mataram- the song that stirred the soul, moved the masses, and became a slogan. Composed in 1875 by Bankim Chandra Chattopadhyay (1838-1894) later incorporated in his 1982 novel Ananda Math (Abbey of Bliss), was set to music very appropriately in Raga Desh by Rabindranath Tagore who sang it in the 1896 session of the Indian National Congress. In reaction to the partition of Bengal by Viceroy Lord Curzon in 1905 *the Swadeshi movement* adopted Vande Mataram as its theme song. The partition of Bengal reformed the course of the Indian Independence Movement and *Vande Mataram* turned into the revolutionary War-Cry, the Freedom Cry.

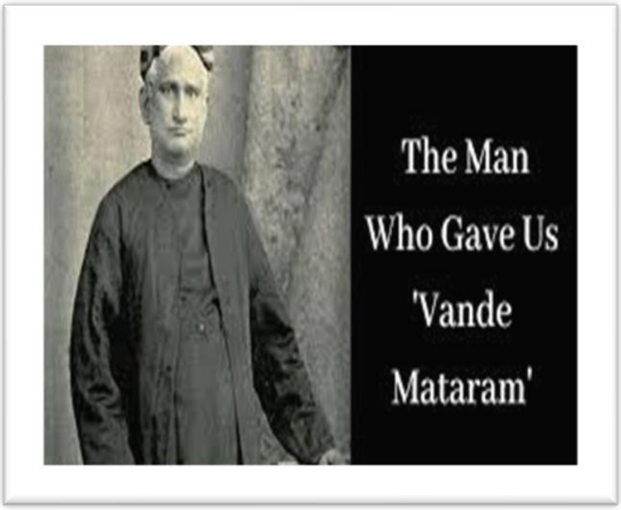

Where the Mind is without fear (*Chitta jetha Bhoy shunya*) by Rabindranath Tagore transcended the time and the country boundaries.

"*Ekla Chalo Re*" by Tagore was one of the 22 protest songs written during the Swadeshi period of Indian freedom movement and along *with "Amar Sonar Bangla*". It became one of the key songs for the Anti-Partition Movement in Bengal Presidency in 1905.

Fast Facts

- The infamous Alipore Central Jail has been converted into a museum to celebrate the country's 75 years of independence (2022). The jail had as its prisoners at various times the freedom-fighters like Sri Aurobindo, Subhas Chandra Bose, Jawaharlal Nehru, Sarat Chandra Bose, Bidhan Chandra Roy and many other stalwarts. Several freedom-fighters were executed here. The dilapidated cells of the freedom fighters have been preserved, and the old gallows are now open to the public.
- Scenes from 1905 -The day partition of Bengal took effect (16th October 1905) was declared a day of mourning throughout Bengal. People fasted and no fires were lit at the cooking hearth. In Calcutta a strike was called. People marched in processions, and band after band walked barefoot, bathed in the Ganges in the morning and then paraded the streets singing *Vande Mataram* which almost spontaneously, became the theme song of the movement.

Some Interesting Facts

- On 26th December 1913 University of Calcutta conferred the honorary degree of DLitt on Rabindranath Tagore.
- The given name of Dinabandhu Mitra of *Nil-Darpan* fame was *Gandharva Narayan* Mitra.

- During his voyage to England in 1890, musician Atul Prasad Sen passed through Italy and inspired by the Gondola rowers' song in Venice, he composed the patriotic song, *Utho go Bharat-Lakshmi.*
- True or not: Once Sri Ramakrishna playing on the meaning of *Bankim* (*Bent A Little*), asked him what it was that had bent him. Bankim Chandra jokingly replied that it was the kick from the Englishman's shoe (he was a well-known critic of the British government).
- Sir Ashutosh Mukherjee, the first Indian vice chancellor of Calcutta University, introduced the award *Jagattarini* Medal named after his mother: the highest honor of that period for original contribution to the literature of Bengal. In 1921 Rabindranath Tagore was the first recipient of the Jagattarini award, Sarat Chandra Chattopadhyay in 1923 and Kazi Nazrul Islam (one of the most important voices of India's freedom movement) in 1945.

- "Had this *Bengal Tiger* (Sir Ashutosh) been born in France, he would have exceeded even Georges Clemenceau, the French Tiger. Ashutosh had no peer in the whole of Europe" said French scholar Sylvain Lévi (1863–1935).
- As Vice-Chancellor, Sir Ashutosh was forced to suspend Subhash Chandra Bose (1897-1945) from Presidency College. However, he took steps to ensure that young Bose's academic life was not disrupted and arranged to have him transferred to another college.
- Sir Ashutosh convinced Sir Tarak Nath Palit (1831-1914) and Sir Rashbehari Ghosh (1845 -1921) to donate money to Calcutta University to create professorship to be held by Indian professors (Sir CV Raman was the first Palit Professor of Physics and Sir Prafulla Chandra Roy was the Palit Professor of Chemistry).
- "If the French Revolution was inspired by French philosophers like Voltaire, Rousseau and Montesquieu, Indian freedom movement was inspired by the most revered Swami Vivekananda," said the Governor of Maharashtra, Vidyasagar Rao on the 125th anniversary of the Chicago Speech.
- Bankimchandra compared Dinabandhu Mitra's *Nil Darpan* to *Uncle Tom's Cabin* for its role in arousing people's awareness of the evils of indigo plantations.
- From 1921 to 1936, Sarat Chandra Chattopadhyay served as the president of Indian National Congress' Howrah branch. His *Pather Dabi* tells the story of a passionate leader of a revolutionary group.
- Rabindranath Tagore was the *Ramtanu Lahiri* Professor of Bengali at Calcutta University from 1932 to 1933. He delivered the Convocation Address in Bengali in 1937.

- Barrister Chittaranjan Das's public career began in 1909 when he successfully defended Aurobindo Ghosh on charges of involvement in the Alipore bomb case.
- Sagar Sangeet (Songs of the Sea) collection of Chittaranjan Das's poems were translated in English around 1912 by Sri Aurobindo (who was in dire need of money in Pondicherry) and he was paid 1000 rupees by Das.

Founding of the University of Calcutta

The Court of Directors of the East India Company sent a *dispatch* in July 1854 to the Governor-General of India in Council, suggesting the establishment of the Universities of Calcutta, Madras and Bombay. In pursuance of that dispatch, the University of Calcutta (Latin *Universitas Calcuttae*) was founded on 24 January 1857. University's first senate included Ishwar Chandra Vidyasagar (1820 - 1891) and Scottish missionary/educator Alexander Duff (1806 -1878), founder of Duff School for Girls, and Scottish Church College among others. The University adopted in the first instance, the pattern of the University of London and gradually introduced modifications in its constitution.

Founding of Hindu College/Presidency College

Raja Ram Mohan Roy (1772 -1833) along with Scottish watch maker/philanthropist David Hare (1775 -1842) were among the founding members of Hindu College/Presidency College (Est. 1817) which produced many freedom fighters from Bengal.

Founding of Bethune School/College for Women

It was founded as the Calcutta Female School in 1849 by John Elliot Drinkwater Bethune (1801 - 1851), who was an educator, mathematician and polyglot from Ealing, London. Ishwar Chandra Vidyasagar was its first Secretary.

Bethune College Alumna Kadambini Ganguly

Ganguly (1861 -1923) was the one of the first two women to graduate from Calcutta University. She became one of the first female doctors in India. She spearheaded many movements during the partition of Bengal. She was the first female speaker at the Indian National Congress.

Bethune College Alumnae who were freedom Fighters

Pritilata Waddedar (1911 – 1932) is considered "Bengal's first woman martyr". Pritilata joined a revolutionary group headed by Master da Surya Sen. She is known for leading fifteen revolutionaries in the 1932-armed-attack on the Pahartali European Club in Chittagong. The revolutionaries torched the club and were later caught by the colonial police. To escape arrest, Pritilata committed suicide by swallowing potassium cyanide.

Kalpana Dutta (1913 - 1995) was a member of the armed independence movement led by Master da Surya Sen, which carried out the Chittagong armory raid in 1930. Surya Sen was arrested but Kalpana managed to escape. To free Surya Sen she tried to bomb the jail with explosives but failed.

Bina Das (1911 – 1986) attempted to assassinate the Bengal Governor, Stanley Jackson, in the Senate Hall of Calcutta University. The revolver was supplied by another freedom fighter and a Bethune

College graduate Kamala Das Gupta. Bina fired five shots but failed.

Founding of University College of Science and Technology (Rajabazar Science College)

March 1914- A galaxy of Indian scientists joined the Chairs set up with the income from the endowments of nearly thirty seven and half lakhs rupees donated by Sir Taraknath Palit and Sir Rashbehari Ghosh who were associated with the National Education Movement in Bengal since the Indian Universities Act of 1904-5 and the partition of Bengal in 1905.

Sir Jagadish Chandra Bose -- the first *Satyagrahi*

Upon his return to India from England (1884), Bose confronted injustice and racial discrimination inflicted by the British rule, under which the education service was practically segregated into two distinct racial camps — Imperial Service for the British and the Provincial Service for Indians — having the very same duties and responsibilities, but with much lower pay for latter. After entering on his duties, Bose found that he was to get one-third of the normal pay. Refusing to submit to this oppression, Bose initiated a struggle with protest, a '*satyagraha'*. Records suggest that Bose continued to perform his duties but refused to encash the cheques for three continuous years that he received from the British government as a form of 'new protest'.

Sir P.C. Ray: the "*Revolutionary in the garb of a Scientist"*

He was a staunch nationalist who had observed the deterioration the Indian society had undergone due to suppression by the British. He was sympathetic towards the revolutionaries and would make arrangements for their shelter and food at his factories. After his death, many revolutionaries and his colleagues mentioned about his indirect support and help in manufacturing explosives.

Dinabandhu Mitra and *Nil Darpan*

Nil Darpan was about the 1858 revolt of the indigo farmers of Bengal against the indigo planters. Soon after its publication the play ignited a major argument in the newspapers. Michael Madhusudan Dutt translated the play into English immediately and Reverend James Long published it. The play got wide publicity in Europe where it was translated into other languages. It was the first play to be staged commercially at the National Theatre in Calcutta; it was one of a number of politicized plays which provoked the Government into enacting restrictive censorship measures on Indian theatre via the 1876 Dramatic Performances Act.

A lawsuit was filed against Rev. Long in 1861 for libeling the editor of the *Englishman* and libeling the indigo planters. Rev. Long was fined a sum of Rs. 1000 and a month of time in jail. The fully packed courthouse was full of sympathy towards the Rev. and the dramatist. The fined sum was paid on the spot by author Kaliprasanna Singha.

Romesh Chunder Dutt (1848-1909) the prominent proponent of Indian economic nationalism

Dutt's thesis on de-industrialization of India under the British rule remains a forceful argument in Indian historiography. To quote him: "India in the eighteenth century was a great manufacturing as well as great agricultural country, and the products of the Indian loom supplied the markets of Asia and of Europe. It is, unfortunately, true that the East Indian Company and the British Parliament … discouraged Indian manufactures in the early years of British rule in order to encourage the rising manufactures of England . . . millions of Indian artisans lost their earnings; the population of India lost one great source of their wealth."

Master da Surya Sen (1894 -1934) and the 1930 Chittagong Armory Raid

Sen led a group of revolutionaries on 18 April 1930 to raid the armory of police and auxiliary forces from the Chittagong armory. The plan was elaborate and included seizing

of arms from the armory as well as destruction of communication system of the city (including telephone, telegraph and railway), thereby isolating Chittagong from the rest of British Raj. After the Chittagong raid and a fierce battle over 80 British Indian Army soldiers and 12 revolutionaries were killed, Sen and other surviving revolutionaries dispersed into small groups and hid in neighboring villages, launching raids on government personnel and property. Sen was arrested on 16 February 1933, tried and was hanged on 12 January 1934.

Abanindranath Tagore (1871 -1951) and Nationalistic Indian art

He advocated in favor of a nationalistic Indian art derived from Indian art history, drawing inspiration from the Ajanta Caves. His work was so successful that it was eventually accepted and promoted as a national Indian style within British art institutions.

Sukumar Ray (1887-1923) and His Poems

In Abol Tabol the poems Bhoy peona and Ekushe Ain were taking a jab at the British rulers.

Rajshekhar Basu (1880-1960) the Chemist and Writer

Basu provided covert assistance to the revolutionaries of the Indian Independence Movement in the form of money and chemicals, and also provided his expertise in making bombs.

A "*Confession*"

Almost all the luminaries described here were associated with two colleges affiliated with Calcutta University: Presidency College/Hindu College and Bethune College. They were *unabashedly* "chosen" for this article as these two happen to be the alma maters of the author.

A Postscript with Personal Anecdotes

Author's paternal grandfather Justice Sir Rupendra Coomar Mitter (1889 -1959) who held an MSc degree in Mixed Mathematics was a law student (both LL.B and LL.M) of Sir Ashutosh. Later Mitter took over the Dumraon Raj case when Sir Ashutosh passed away in Patna in 1924.

Author's father Samarendra Kumar Mitra (1916 -1998) was an MSc student of Chemistry and later an MSc student of Applied Mathematics in Rajabazar Science College in the late 1930's. He, along with a few other "muscular" students, often lifted up and *effortlessly* carried Professor PC Roy (who was very frail at that time and unable to climb the lofty staircase) to the 3rd floor of the Tarak Nath Palit Building.

References

https://www.mintageworld.com/media/detail/2676-the-immortal-song-vande-mataram-/
https://www.tribuneindia.com/news/comment/bose-led-the-way-with-his-satyagraha-423984
https://en.wikipedia.org/wiki/Bethune_College
https://en.wikipedia.org/wiki/Kadambini_Ganguly
https://en.wikipedia.org/wiki/Ashutosh_Mukherjee
https://www.indiatoday.in/education-today/gk-current-affairs/story/chittaranjan-das-14469-2016-06-16
https://en.wikipedia.org/wiki/Kalpana_Datta
https://timesofindia.indiatimes.com/city/kolkata/campuses-to-pay-homage-to-freedom-fighter-alumni/articleshow/93490177.cms
https://en.wikipedia.org/wiki/Dinabandhu_Mitra
https://www.exoticindiaart.com/book/details/indian-for-all-seasons-many-lives-of-r-c-dutt-nad207/
https://en.wikipedia.org/wiki/Prafulla_Chandra_Ray
https://physicstoday.scitation.org/doi/10.1063/PT.3.3267
https://rajbhavan-maharashtra.gov.in/en/vivekananda-was-a-torchbearer-of-indias-freedom-movement-maha-governor/

ভারতের স্বাধীনতার
৭৫ বৎসর

What You Owe the Country You Left Behind

Arun Guha

This is a personal note to my fellow immigrants from India. In Fall 1958, I joined IEEE, the American professional association for Electrical Engineers. Soon thereafter a news item published in the IEEE bulletin made an indelible impression on me. A reputed British professor of EE was visiting New York City and gave a talk at a farewell ceremony. His comment was that in a few days in NYC, several people had asked him about new innovations in which they could invest. Then he paused and said, in England, nobody has ever asked him that question. My thought was: if a country like England laments about lack of initiative, what about India?

I have the answer to my question now. The Indian immigrant community in the USA is recognized to be very successful (perhaps the most successful) in many fields: academia, professions, industry. Even the CEOs of some mammoth companies are of Indian origin. How did this happen?

The answer is in two parts.

First: the immigration legalities. USA was founded for the benefit of Whites, mainly from England. In the fifties, I was thrilled to read Thomas Jefferson's declaration that "all men are created equal." It took years for me to discover that he himself did not live his life as if he believed it. (He had hundreds of black slaves and did not give his fatherly affection to several children he had with a slave woman.) All the way up to the end of the nineteenth century, Indian immigration to the USA was virtually nil. On the other hand, immigration was wide open to White Europeans. Large groups of people from Europe arrived at Ellis Island and became landed immigrants (A man named Larry Wallace used to be my bridge partner many years ago. His family came from Lithuania. Larry told me the story that when his grandfather came up the line to the immigration table and the officer asked his name, he said a long Lithuanian name starting with a W. The immigration officer told him, that won't do, from today you are Wallace (which is an English name). Larry used to be a Deputy Solicitor General and held the record for largest number of Supreme court appearances.)

Kumar Barve (obviously of Indian origin) is a long-time member of the Maryland general assembly. His grandfather, Shankar Gokhale, had come to America. He was a physics professor at Nagpur college. He did something that displeased the British Indian government which asked the principal to fire him. Gokhale found a job at GE and eventually became a section head which was highly unusual at the time. (Interestingly, the letter of recommendation the British Principal wrote for him included a statement that he is quite reliable even though a Hindoo.) Massachusetts made him a state citizen, but he could not become a US citizen. In the mid-twenties, the Supreme Court ruled that people from India, even upper class Hindoos, are not White and could not be citizens. Congress passed the Immigration Act of 1924 that completely excluded immigrants from Asia. That remained in force till the mid-sixties when an accident of history changed things. If that change had not happened, many of us would not be here.

John Kennedy, Democrat from Massachusetts, became president in 1960. In the Democratic primary his opponent was Lyndon Johnson, long-term senator from Texas. Southern Whites used to be Democrats only because Lincoln was a Republican. The Democratic Party agenda was controlled by the liberal leadership and although the South had a large voting block, they did not share the liberal political philosophy of Democrats from the Northeast or the West Coast. Both House and Senate used to be Democratic starting in the 1930s because the Great Depression of 1929 was blamed on the Republicans. After winning the Democratic nomination, Kennedy offered

Johnson the Vice-Presidential nomination. Johnson accepted but he never could enter Kennedy's inner circle. After JFK was assassinated in November 1963, Johnson became president. But he was a changed man - no longer a typical Southerner. (It is still a mystery to historians how that happened.) He pushed through all of JFK's liberal agenda, and because of his skill in lawmaking as a senator, he did a far better job than what JFK might have been able to accomplish. Historians agree that next to Lincoln, Johnson had done the most for Americans of color. Laws were passed, including one on immigration reform in October 1965 and another one on civil rights. William Fulbright, senator from Arkansas and a friend, told Johnson that the Democratic party will lose the South for fifty years. That estimate was wrong - it may be much over a hundred years. The solidly Democratic South of 1960 has turned into solidly Republican South of 2020, except that it now controls the party agenda.

The immigration reform act of 1965 opened the floodgates on the immigration of non-Whites from all over the world. But why is it that Indians have been more successful compared to other communities from other countries?

China asked a similar question about the success of India's software industry and sent a delegation to India in the early nineties. They went back with the answer that the key was the proficiency in English. China started sending young students to America to learn English and opened four regional institutes in China for teaching English (we had one of their graduates as a tour guide about fifteen years ago.) Chinese leaders all wear Western style clothes.

But familiarity with the English language, though important, is not the complete answer. The two real drivers have been the provision in the immigration act to prioritize highly skilled candidates for immigration and the tremendous emphasis placed on science and technology education by Indian leaders led by Nehru starting at independence.

The education system in British India was designed mainly to produce clerks and administrators to run the government, and lawyers to help maintain law and order. At independence, there were perhaps ten engineering colleges in India -- some government and some private. Special mention could be made of the Indian Institute of Science in Bangalore which Jamshedji Tata established following a suggestion by Vivekananda (to encourage science and technology education, neglected by the British Indian government) during a chance meeting in 1893 on a ship from Japan to Canada. After independence in 1947, the new Indian government under Nehru placed a strong emphasis on improving technical education. Funding was provided to upgrade existing colleges and establish new ones. The director of IISc (Jnan Ghosh) was tasked with building the first IIT (in Kharagpur) which served as the model for over twenty more to follow. There are perhaps well over a hundred engineering colleges in India today. This massive investment has paid off. On a personal note, my first trip to the US was in 1958 as a trainee in the Engineering Teacher Training program which was established to fill the empty teaching positions of new engineering colleges.

My first realization of the contribution by the Indian diaspora was from a comment made by Indira Gandhi sometime in late 70s or early 80s. For the first several decades of independence, India did not produce enough to feed itself because of the conditions Britain left behind. Green revolution has changed the situation. But for many years, India had to depend on aid from the USA and other countries. In the sixties, in Washington DC, the staff of the India Supply Mission (to procure stuff to be sent to India) used to be large compared to that of the Indian Embassy. Indira Gandhi once commented that the aid is not going in only one direction, we are also providing aid to America by training technical manpower that America does not have to pay. Well said. (I spent hours on google to locate that quote but

couldn't find it, leaving it as an exercise to the reader.)

All of the above was by way of introduction for the point that I really want to make. Most of us make charitable contributions for many causes, some in India. But if you wish to help India develop and prosper, one of the best ways would be to contribute to the education of deserving young persons who have the potential but not the resources. And you do not have to do the hard work of figuring out how to find the right candidates, I will show you an easy way.

Let me introduce you to Mohnish Pabrai (google) and his organization Dakshana Foundation (google). Mohnish was born in a Sikh family settled in Mumbai. After high school, he came to Clemson University in South Carolina and got interested in Finance. He also became fascinated by the life history of Warren Buffett and decided to adopt him as a role model. And he has. He runs an investment company and has been very successful. Has written books about the Warren Buffet method of investment. And he has been following Buffett's example of giving back to society. Buffett famously sells himself (or his time and company over lunch) once a year to the highest bidder, the money going to charity. Mohnish and a friend once paid over $600,000 to buy that honor.

Educational opportunities are now available in India. But there are many deserving candidates from poor families who have the potential but not the resources to take advantage of it. The goal of his foundation is to find such students and prepare them for admission to IIT, NIT, medical schools, etc. My understanding is that his organization provides all of the fixed costs and seeks donations that go towards supporting more students. The annual reports Dakshana publishes are transparent and have great detail. Warren Buffet himself has reviewed his operation and liked it.

Most of us who immigrated from India and made a career in America have benefited from the education we received in India. A donation to Dakshana would be a way to give back and show our gratitude -- it will not be just a gift but an investment. Thank you.

PS: One of the editors has confirmed his recollection of the Indira Gandhi statement.

হীরা

ভারতী মিত্র

আজকের কাহিনীর শুরু ইংরেজির উনিশশো একত্রিশ সালে – পরাধীন, নিপীড়িত ভারতবর্ষে।

বরিশাল জেলার বেলদাখান গ্রামের এক বর্ধিষ্ণু গৃহস্থের কুটিরের উঠোনে গৃহকর্ত্রী সারদাসুন্দরী দেবী উবু হয়ে বসে চাল বাছছেন কুলোয়। এমন সময় দুটি ছোট ছেলেমেয়ে খিড়কির খোলা দরজা দিয়ে নিঃশব্দে প্রবেশ করে উঠোন পেরিয়ে সারদা দেবীর কাছ ঘেঁষে দাঁড়ায়। মেয়েটির বয়েস বছর আষ্টেক, ছেলেটির সাত। উজ্জ্বল, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। বোঝা যায় সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তান।

সারদা দেবী তাদের লক্ষ্য করেননি দেখে ছেলেটি সাহস করে মিষ্টি অথচ ভীরু গলায় বলে ওঠে, "মাওই মা, আছেন ক্যমন?"

সারদা দেবী মুখ তুলে তাকিয়ে বিরক্ত হন, "পোষ্টমাষ্টারের পোলা-মাইয়া? তগো দিদিরে লইতে আইসঅ?"

"হ – মায়ে কইয়া দিসে, লইয়া আয়, কয়ডা দিন থাইক্যা যাইব"।

সারদা দেবী ভেঙ্গিয়ে ওঠেন, "থাইক্যা যাইব?! আর আমাগো কি হইব? আমরা বানের জলে ভাইস্যা আইছি?! এইহানে, অর শ্বশুরবাড়ীতে, থাহন লাগব না? মন বসে ক্যামতারা? যদি কয়দিন অন্তরই বাপের বাড়ী লইয়া যাইতে তগো পাডাইয়া দ্যায়?"

ছেলেটি থতমত খেয়ে খানিকটা পিছিয়ে যায়। অগত্যা মেয়েটি এগিয়ে আসে। গলা যথাসম্ভব নরম করে বলে, "মাওই মা, শোনেন, এইত' কয়ডা দিন পরেই ফিরাইয়া আনুম হানে?"

সারদাদেবী হঠাৎ কান্ডজ্ঞান হারিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে চিৎকার করতে শুরু করে দেন, "না, পাডামু না, কি করবি কর! তর মায়ের আর বাপেরে ক গিয়া, দেহি অরাই বা কি করে!"

বাচ্চাদুটি বেশ বুঝতে পারে, আশা নেই। মেয়েটি তাও কুঁইকুঁই করে বলে ওঠে, "মাওই মা, আপনেই ত দিদির মা, আমাগো মায়ে-বাপে আর কবে কি? যদি দয়া হয় আপনার··· দিদিরে যদি ছাইড়া দ্যান···"

"না, দিমু না! চইল্যা যা আমার সমুখ থিক্যা। সহ্য করতে পারিনা এই পোলাপানগুলারে!"

এর ওপরে আর কথা নেই। ছেলে-মেয়েদুটি গুটিগুটি পায়ে কাঁদোকাঁদো মুখে পিছু হটতে হটতে শেষে খিড়কীর দরজা গলিয়ে বাইরে বেরিয়েই লাগায় এক ছুট। আলের ওপারে গিয়েই কিন্তু উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে দুজনে। মাওইমা দিদিকে ত দিলেনই না এমনকি দিদির সঙ্গে চোখের দেখাটুকু পর্যন্ত করতে দিলেন না। কুকুর-বেড়ালের মতন দূরদূর করে খেদিয়ে দিলেন। এই কাঠফাটা রোদ্দুরে দুক্রোশ পথ হেঁটে আসা দুটি বালকবালিকার প্রতি তাঁর এতটুকু দয়া হলনা। একটু জল-বাতাসা দিয়ে অতিথির প্রতি সাধারণ সৌজন্যটুকু প্রকাশের কথাও বিদ্বেষের তাড়নায় বিস্মৃত হলেন তিনি।

হীরার বিবাহ হয় বারো বছর বয়েসে তাদের গ্রাম ঝালকাঠি থেকে ক্রোশদুয়েক দূরের বেলদাখান গ্রামের একটি

সম্পন্ন ঘরের শিক্ষিত ছেলে সুকান্তর সঙ্গে। ছোট ভাইবোনদুটি সোনা ও মানিক মাঝেমধ্যেই আসে তাকে বাপের বাড়ী নিয়ে যেতে এবং বেশীর ভাগ সময়েই তারা ফেরে খালি হাতে। বউকে বাপের বাড়ি পাঠানোয় প্রচন্ড

আপত্তি সুকান্তর মায়ের। সুকান্ত বিয়ের পরেই কলেজে পড়তে শহরে চলে যায় এবং পরীক্ষার অজুহাতে পারতপক্ষে বাড়িমুখো হয় না। তাই বিয়ের পরে সাধারণভাবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে, হীরা তার স্বাদ পায় না।

এদিকে শহরে কলেজের পড়াশুনোর ফাঁকে ফাঁকে সুকান্ত যে "যুগান্তর" নামক একটি স্বাধীনতা-সংগ্রামী দলে নাম লিখিয়ে ফেলে, একথা সুকান্তর পরিবারের কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে না। অবশেষে যখন যুগান্তর, অনুশীলন, শ্রীসংঘ ইত্যাদি বাংলার বিপ্লবী দলগুলি হঠাৎ সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে তৎপর হয়ে ওঠে, এবং বরিশালের অত্যাচারী পুলিশ ইন্সপেক্টর যতীশ দারোগা বিপ্লবীদলের নেতা রমেশ চ্যাটার্জির হাতে নিহত হন, তখন ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যায়।

এই হত্যাকান্ডে রমেশ ও তার কয়েকজন সাঙ্গোপাঙ্গো ধরা পড়ে এবং তাদের মধ্যে সুকান্তও একজন। সে রমেশের ছেলেবেলার বন্ধু। বৃটিশ কর্মচারী হত্যার অপরাধে রমেশের ফাঁসির হুকুম হয়, কিন্তু পরে তাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়ে আন্দামানে পাঠানো হয়। সুকান্তর বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ না থাকায় তাকে পাঠানো হয় হিজলী ক্যাম্পে।

পিতা সুভাষ ও মাতা সারদাদেবীর বুকে পুত্রের গ্রেফতারের খবর শক্তিশেলের মতন বাজে। তাঁরা হীরাকে সঙ্গে নিয়ে যখন দেখা করতে যান, সুকান্ত দেখা দেয় না। ভগ্নহৃদয়ে অশ্রুসজল চোখে শূন্য গৃহে ফিরে আসেন পিতামাতা। হীরাও কিছুটা হতাশ হয়, কিন্তু যে লোকটিকে সে প্রায় চেনেই না, চোদ্দ বছরের বালিকা-হৃদয়ে তার সঙ্গে দেখা না হওয়ার দুঃখ সে ততটা অনুভব করে না। বলাই বাহুল্য পুরো ব্যাপারটির গুরুত্ব বোঝবার মতন বয়েস তার তখনও হয় নি। পড়শীদের গাছে চড়ে, ফল চুরি করে, দোলনায় দুলে, কাঠবিড়ালীর পিছনে দৌড়ে, বাঁদরদের ভেংচি কেটে, আর পাড়ার যত ডানপিটে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলাধূলো করে তার কিশোরী জীবন কাটতে থাকে।

এর মাসছয়েক পর একদিন রাত্রে হীরার শোবার ঘরের জানলায় টোকা পড়ে। হীরার ঘুম সাধারণতঃ খুব গাঢ়, কিন্তু কিছু পূর্বে পাড়ার কুকুর লালুর পরিত্রাহি চীৎকারে ঘুম পাতলা হয়ে গিয়ে থাকবে। টোকা শুনে পায়ে পায়ে জানলার কাছে উঠে এসেই চমকে ওঠে যেন ভূত দেখেছে! দেখে সুকান্ত চুপচাপ জানলার বাইরে বাগানে দাঁড়িয়ে হাসছে। চুল তার উস্কোখুস্কো, বেশ আলুথালু। ছুটে গিয়ে সন্তর্পণে খিড়কির দরজা খুলে দেয় হীরা। সুকান্ত পা টিপে টিপে প্রবেশ করে – সাবধানে দালানের ঘটি থেকে জল নিয়ে ধূলিমলিন হাত পা ধোয়। হীরা ছুটে গিয়ে সাবান আর গামছা এনে দেয়, রান্নাঘরের মেঝের ওপর আসন পেতে বসিয়ে পান্তা ভাত আর কুচো চিংড়ির চচ্চড়ি দেয় খেতে। আলগোছে হাওয়া করে। শেষে আর কৌতূহল চাপতে না পেরে জিজ্ঞেস করে, "আইলা ক্যমনে? পলাইয়া আইসঅ?"

সুকান্ত হাসে, বলে, "হ"।

"অরা ত আইস্যা পরল বইল্যা তোমার খোজে!" হীরার স্বরে উৎকণ্ঠা।

"জানি। খাইয়াই চইল্যা যামু – আইসিলাম তোমার লগে দ্যাখা করতে!"

দুচোখে জল ভরে আসে হীরার – যাবে কোথায় মানুষটা? বৃটিশ রাজত্বে জেল ভেঙ্গে পালিয়ে কতদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারবে সে? কুকুরের মতন তাড়া খেয়ে এদিক-ওদিক যাবে, কিন্তু সে আর কদিন?

"চিন্তা হয় তোমাগো লাইগ্যা। দ্যাশ স্বাধীন করতে চাও, পারবা কি অগো লগে?"

"জানিনা। চ্যাস্টা ত করুম, হয় দ্যাশেরে স্বাধীন করুম নয় ত জীবনদান করুম!"

"কও কি? আমাগো কথা ভাইব্যা দ্যাখসঅ? আমাগো কী হইব?"

"তোমার লাইগ্যা চিন্তা কী? চারজন বাপে মায়ে তোমারে আগলাইয়া রাখবে হনে!"

"হ! বাপ-মায়ে মাথাগুলান লোহা দিয়া বান্ধাইয়া আইসে? বুড়া হইব না?"

হাসে সুকান্ত। আহার শেষে নিঃশব্দে যেমন অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে এসেছিল, তেমনি অন্ধকারেই মিলিয়ে যায়। আলো নিভিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়ে হীরা - তার নৈশ অতিথির আগমনের সমস্ত চিহ্ন যথাসম্ভব মুছে ফেলে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ বাড়ী ঘেরাও করে – তল্লাসী চালায় – আসবাবপত্র তছনছ করে, বাড়ীর বাসিন্দাদেরকে প্রশ্নবাণে এবং নানা অপমানে জর্জরিত করে। শেষে খালি হাতে ফিরে যাবার সময় শাসিয়ে যায় যে ধরা পড়লে সুকান্ত দাশগুপ্তকে এবারে হয়ত আন্দামানের কালাপানির স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। সপ্তাহ-খানেকের মধ্যেই ধরা পড়ে সুকান্ত। এবারে তাকে রাখা হয় আলিপুর জেলে। এইবারে যখন দেখা করতে যায় এরা, মা সারদাদেবীকে কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে দেখে সুকান্ত বলে ওঠে, "মা, কাইন্দ্যো না, দ্যাশ স্বাধীন না কইর‍্যা থামা নাই। তাতে যদি মৃত্যুও হয়, তাও সই। কাইন্দ্যো না মা, দেইখ্যো, আমি মরুম না। স্বাধীন দ্যাশের নাগরিক হওয়ার জইন্যই বাইচকা থাকুম।"

এই ঘটনার বছরখানেকের মধ্যেই জানা যায় যে পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্ডেন্ট ভূপেশ চ্যাটার্জিকে আলিপুর জেলে লোহার ডান্ডা ইত্যাদি দিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেনডেন্ট ভূপেশ চ্যাটারজি তৎকালীন আলিপুরের জেইলর-এর বন্ধু ছিলেন। তাই প্রায়ই তিনি আসতেন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। মাসে কমপক্ষে বারদুয়েক ভূপেশ-বাবু এসে জেল পরিক্রমা, প্রাতঃরাশের সময় কয়েদীদের সংখ্যা গণনা, বন্দীদের অবস্থাদি নির্ণয় করা, ইত্যাদি কাজে বন্ধুকে সাহায্য করতেন। ভূপেশ-বাবুর হাতের লোহার ছোট ডান্ডাটি তিনি যখন গরু-ছাগল গণনার ন্যায় বন্দীদের মাথায় ঠেকিয়ে গুণতেন, বন্দীরা, বিশেষ করে রাজবন্দীরা, তখন অপমানে ফুঁসতেন!

উক্ত ঘটনার দিন ভূপেশ-বাবু রাজবন্দীদের ওই ভাবে গণনা করতে গিয়ে যখন সুকান্ত দাশগুপ্তের মাথায় ডান্ডাটি ঠেকালেন, সে কিন্তু সেটিকে ছিনিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ভূপেশ-বাবুকে সেই ডান্ডার বাড়ি মারতে শুরু করে দিল। দেখাদেখি অন্যান্য রাজবন্দীরাও ভূপেশ-বাবুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অন্য হাতিয়ারের অভাবে তাদের নিজেদের অ্যালুমিনামের থালা-গেলাস-বাটি দিয়ে তাঁকে এলোপাথাড়ি পিটতে লাগল। ভূপেশ-বাবু রক্তাক্ত-কলেবরে ধরাশায়ী হলেও তারা থামলনা। পাগলা ঘন্টি বেজে উঠল। জেলরক্ষীরা বন্দীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লাঠিচার্জ করে অনেক বন্দীকে গুরুতরভাবে আহত করল। ভূপেশ-বাবু সেদিনই হাসপাতালে মারা গেলেন। হত্যার অপরাধে অনন্তহরি মিত্র ও প্রমোদ সেনের ফাঁসি হল। সুকান্ত দাশগুপ্ত, ধ্রুবেশ চ্যাটার্জি, অনন্ত চক্রবর্তী ও রাখাল দে-র বয়েস অল্প বলে তারা ফাঁসির রজ্জুকে ফাঁকি দিতে সক্ষম হলেও এঁদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দন্ড হয় এবং কয়েক মাসের ভেতরেই এদেরকে আরও অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে সুদূর আন্দামানের বিভীষিকাময় সেলুলার জেল-এ পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তখন ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ। উদ্ভিন্নযৌবনা পঞ্চদশী হীরা যদিও তখনও শরৎবাবুর নায়িকাদের মতন পূর্ণবয়স্কার বিচক্ষণতা অর্জন করেনি, তবু সুকান্তর সঙ্গে তার যে আর কোনদিন দেখা নাও হতে পারে, তা সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে।

সেসময়ে সেলুলার জেল-এর কয়েদীদের বছরে একখানা করে চিঠি লেখবার অধিকার দেওয়া হত এবং আত্মীয়-স্বজনের কাছ হতেও বছরে মোটে একটি চিঠি পেতে পারত তারা। বন্দীদের ওপর নিয়মিতভাবে পাশবিক অত্যাচার করা হত। এর দরুণ প্রতি মাসে গড়ে তিনজন করে কয়েদী আত্মহত্যা করতেন। হিন্দু কয়েদীদের পৈতা পরিধানে ও মুসলিম কয়েদীদের নামাজের টুপী পরা বারণ

ছিল। দুঃখের বিষয়, আন্দামানের বন্দীদের দুঃসহ কারাযন্ত্রণা ভোগের খবর ইংরেজ সরকার বহুদিন সযত্নে বিশ্বের সভ্যজগতের অগোচরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। বন্দীরা কেউ যদি কারাবাসের পরিবেশ বা অবস্থার বর্ণনা দিয়ে তাঁদের আত্মীয়স্বজনকে কখনও চিঠি দেবার চেষ্টা করতেন, সেসব চিঠি তৎক্ষণাৎ বাজেয়াপ্ত করা হত।

কাগজ পড়ে এবং চারিদিকের মানুষজনের আলোচনার মাধ্যমে হীরা ক্রমশঃ বুঝতে পারে যে তার স্বামী সাধারণ বিপ্লবী নয়। সূর্য সেন, নিরঞ্জন সেন, রমেশ আচার্য্য, ভূপেন দত্ত, অম্বিকা চক্রবর্তীর মতন সেও বিপ্লবীদের এক নেতা। হীরা সংকল্প করে যে ভারতবর্ষের এই স্বাধীনতা সংগ্রামে তার নিজেরও একটি ভূমিকা আছে··· কিছু করণীয় আছে। বাংলাদেশে সশস্ত্র বিপ্লবীরা তখন অর্থ সংগ্রহে তৎপর। অস্ত্রশস্ত্র ও বোমা তৈরীর মালমশলার জন্য তখন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন।

হীরা তার বিয়েতে যৌতুক পাওয়া গহনার বাক্সটি নিয়ে একদিন চুপিসাড়ে রাতের অন্ধকারে সুকান্তর বন্ধু বিপ্লবী সুধীর আইচের সঙ্গে দেখা করে।

সুধীর অন্ধকারেও হেসে ওঠে – "করসঅ কী? হগল দিয়া দিলা? শাশুড়ী ঠাইরান জিগাইলে কবা কী? চোরে নিসে?"

"সত্য কথাই কমু। দ্যাশের লইগ্যা দিসি। অর পোলায় দ্যাশের লইগ্যা জীবনদান করতে পারে, আর আমি কয়খান গহনা দিতে পারি না?"

"হ, পার বই কি!" গম্ভীর হয়ে ওঠে সুধীর, "দ্যাশ স্বাধীন হইবই কিসুদিনের মইধ্যে, দেইখ্যা লইও, এই আমি তোমারে কইয়া দিলাম!"

বিভিন্ন বিপ্লবীদলগুলির সশস্ত্র কর্মকান্ডের বিস্তৃত বিবরণ কাগজে পড়ে হীরার দিন কাটতে থাকে। রোমাঞ্চিত হয় সে ··· তার নিস্তরঙ্গ জীবনে ওঠে ঢেউ। আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে পলায়ন করে পূর্ণানন্দ দাস, নিরঞ্জন ঘোষাল, সতীনাথ দে ও হরিপদ দে। রোহিণী বড়ুয়া চট্টগ্রাম জেলার আবুরখিল গ্রামের অত্যাচারী দারোগাকে হত্যা করে ফাঁসি যায়। দার্জিলিংয়ের ঘোড়দৌড়ের মাঠে লিবং এর কুখ্যাত গভর্নর অ্যান্ডারসনের ওপর গুলি করা হয়। বিলেতে ওধর্ম সিং নামক এক পাঞ্জাবী যুবকের হাতে মৃত্যু বরণ করে জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকান্ডের হোতা জেনারেল ডায়ার এবং সেই সময়কার পাঞ্জাবের গভর্নর মাইকেল ও ডায়ার। এছাড়াও বহু খানাতল্লাসী, আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমাবারুদ বাজেয়াপ্ত, পুলিশের সঙ্গে বিপ্লবীদের খন্ডযুদ্ধ ইত্যাদির খবর প্রতিদিন আসতে থাকে··· হীরাকে চঞ্চল করে তোলে। সাম্রাজ্যবাদী নিষ্ঠুর শাসকদলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় সারা দেশের লোক··· কারাবরণ করে হাজার হাজার মানুষ··· "জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন।"

এইভাবে বছরগুলি কাটে। হীরা যুবতী হয়ে ওঠে, কেউ চেয়েও দেখে না। সেই চালবাছা, জল তোলা, ঘর ঝাড়া, রান্নাবাড়া, উঠোন নিকোনো। সুকান্ত চিঠি লেখে কালেভদ্রে, গোপন সরবরাহকারীদেরকে ঘুষ খাইয়ে। হীরা জানতে পারে সেলুলার জেলের দুঃসহ নিষ্পেষণের কাহিনী··· দুর্গন্ধ অন্ধকার খুপরিতে দিনের পর দিন বন্ধ থাকে বন্দীরা, মলমূত্র ত্যাগ খুপরির এককোণে রাখা একটি হাঁড়িতে। কোনও লেখাপড়া বা পত্রপত্রিকার ব্যবহার সেল-এ নিষিদ্ধ। সমস্তদিন, অর্থাৎ যতক্ষণ সূর্যের আলো থাকে ততক্ষণ, কাজ – ছোবড়ার দড়ি পাকানো – খাট, বালিশ, বিছানা, বা বাতির বালাই নেই – আছে শুধু দুটি দুর্গন্ধ কম্বল – রাত্রি হলেই যার মধ্যে এসে বাসা বাঁধে রাজ্যের পোকামাকড়, বিছে – বন্দীদের খাবার দেওয়া হয় অখাদ্য তরকারী, অর্ধসিদ্ধ ডাল, খানকতক পোড়া রুটি বা একটুখানি ঠান্ডা ভাত। সুকান্ত লেখে, বন্দীদের শরীর-মন ভেঙ্গে পড়ছে··· তারা বেশ বুঝতে পেরেছে এ তাদেরকে তিলে তিলে হত্যা করার ষড়যন্ত্র। করিডোরে বা কাজের ফাঁকে ফাঁকে দেখা হলে বন্দীদের মধ্যে তাই চলে নিঃশব্দে আলোচনা··· কী করা যায়?

হঠাৎ একদিন হীরা কাগজে পড়ে, রাজবন্দীরা আন্দামানের চীফ কমিশনারের কাছে চরমপত্র পেশ করেছে যে ভালো খাদ্য, আলো, ও লেখাপড়ার সুযোগ,

এই তিনটি জিনিষ না পেলে তারা আমরণ অনশন ধর্মঘট শুরু করবে। চীফ কমিশনার জানিয়ে দিলেন, "আমি সামান্যতম দাবীও মানবো না। বন্দীদের মৃতদেহ সমুদ্রে ভাসিয়ে দাও।"

অতএব অনশন শুরু হয়।

এই অনশন চলে দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ দিন। এর মাঝখানে জোর করে নাকে নল ঢুকিয়ে দুধ খাওয়াবার চেষ্টায় ফুসফুসে দুধ ঢুকে তিন রাজবন্দীর – মোহিত মিত্র, মহাবীর সিং এবং মোহন দাসের - মৃত্যু হয়। অনশনের খবর শোনার পর থেকেই সারদাদেবী আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেন। অগত্যা হীরার দিনের বেশীর ভাগ সময় কাটতে থাকে শাশুড়ির তদারকি করে··· কী করে একটি সন্দেশ, একগাল ভাত বা একটুকরো মাছ খাওয়ানো যায়, তারই ফন্দিফিকির খুঁজে। নিজের মনের উদ্বেগ মনেই চাপা থাকে।

রাতে ঘুম আসতে চায় না – অবাক হয়ে ভাবে হীরা – এই যে তার স্বামী – যার জন্য রোজ চোখ ফেটে জল আসে তার – চিন্তায় ঘুম হয় না – তাকে সে জীবনে দেখেছে ক'বার? এঁরই অনশন-জীর্ণ মুখচ্ছবি ক্ষণে ক্ষণেই কেন পড়ে তার মনে? এঁর আগুনের মত জ্বলন্ত দুটি চোখে একই সঙ্গে ইংরাজের পাশবিক রাজত্বের প্রতি ঘৃণা এবং স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বপ্নে বিভোর এক অনির্বচনীয় দীপ্তি সে যেন মানসচক্ষে দেখতে পায়। শুধু সুকান্ত নয়, শত শত অনশনরত বীর রাজবন্দীদের শরীরের ঘাম সে মুছিয়ে দিতে চায় তার আঁচলের প্রান্তে ।

শেষপর্যন্ত বন্দীরাই জয়ী হয়। ইংরেজ শাসক চতুর্দিক থেকে চাপে পড়ে বন্দীদের দাবী মেনে নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু অনশন, তীব্র অসুখের চাইতেও সত্বর বন্দীদের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে দেয় – অনেক বন্দী গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সুকান্তর চিঠি আসে, "সব ঠিক আছে, চিন্তা কোর না, আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি।" হীরা নিশ্চিন্ত হয় – বন্দীরা এইবার হয়ত একটু সুখ-স্বাচ্ছন্দের মুখ দেখতে পাবে।

তপন নামে পাড়ার একটি যুবক বহুদিন থেকেই হীরার প্রতি আকৃষ্ট ছিল। কিছুদিন যাবৎ হীরা অনুভব করে ছেলেটির দৃষ্টি যেন হীরাকে অষ্টপ্রহর অনুসরণ করে ফিরছে। পুকুরঘাটে গেলেই টের পায় গাছপালার ফাঁক দিয়ে কেউ তাকে দেখছে! সেদিন স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে ফিরছিল হীরা, হঠাৎ দেখে তপন তার সামনে দাঁড়িয়ে।

হীরা প্রথমটা থমকে যায়। পরক্ষণেই পাশ কাটিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করে। তা দেখে তপন ছেলেমানুষের মতন দু হাত মেলে একেবারে পথ আগলে দাঁড়ায়। "যাইও না, শোনো, আমি তোমার দুঃখ বুঝি। তোমার সোয়ামী যাবৎজীবন কারাদন্ডে দন্ডিত। তোমার শ্বশুর-শাশুরি তোমারে বাপের বাড়ী যাইতে দেয় না – তোমার সাধ-আহ্লাদ কিছুই মেডে নাই – আমি হগল জানি।"

হীরা গম্ভীর দৃঢ় কণ্ঠে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে ওঠে, "হেইলে আপনের এও জানা উচিৎ যে আমি ভদ্রঘরের মাইয়া, অপরিচিত পুরুষ-মাইনশের লগে আমি কথা কই না"|

কথা ক'টি ছুঁড়ে দিয়েই ত্বরিৎপদে বিদায় নেয় হীরা। এ এক আপদ। সহানুভূতি জানাবার আর লোক পেল না! গৃহস্থ বধূকে স্বামীর অনুপস্থিতিতে ফুঁসলানোর চেষ্টাকে আর যাই হোক, প্রশংসনীয় বলা চলে না।

এদিকে সারদাদেবীর স্বাস্থ্য ক্রমশঃই শোকে, অনিয়মে, অনশনে ভেঙ্গে পড়ে এবং বছরখানেক পরে একমাত্র সন্তান সুকান্তকে শেষ দেখাটুকুও দেখতে না পারার দুঃখ বুকে নিয়ে তিনি ইহজগত থেকে বিদায় নেন। এর বছর তিনেক পরে হীরা জানতে পারে নানাবিধ দাবীদাওয়া নিয়ে আন্দামানের বন্দীরা আবারও অনশন ধর্মঘট শুরু করেছেন। প্রথমবারের অনশনের পরে কিছু দাবী মিটলেও বন্দীদশার তেমন উন্নতি হয়নি।

এবারকার অনশন চলে ছত্রিশদিন। নন্দলাল দাশগুপ্ত-প্রমুখ অনেক অল্পবয়সী বন্দীরাও এতে অংশগ্রহণ করেন| সুকান্ত যথাসময়ে লেখে, "আমরা একটু একটু করে জয়ী

হচ্ছি।" এর মাসদুয়েকের মধ্যেই হীরা জানতে পারে, এবারের অনশনের পরে অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে সুকান্তর শরীর একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছে। তাই তাকে আন্দামান থেকে এবারে নতুন তৈরী দমদম সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে - কারণ লাগোয়া একটি হাসপাতাল আছে, যেটা মস্তবড় সুবিধে।

শ্বশুরকে নিয়ে সুকান্তর সঙ্গে দেখা করতে যায় হীরা। কিন্তু প্রথমটা প্রায় চিনতেই পারে না। এ কী চেহারা হয়েছে মানুষটার মাত্র এই ক'বছরে? সুকান্তর কোটরগত চোখ, কালিলেপা শীর্ণ অস্থিসার মুখ, ও কংকালসার ক্ষয়া শরীর দেখে বোঝবার উপায় নেই যে সে মাত্র উনত্রিশ-বৎসর বয়স্ক এক যুবক। তাছাড়া তার সেই আগেকার জ্বলন্ত মর্মভেদী দৃষ্টি গেল কোথায়? তার বদলে চোখে যেন কেমন এক অপ্রকৃতিস্থ চাউনি। বাবাকে দেখে দেয়ালের ওপার থেকে স্বভাবসিদ্ধভাবে দু হাত তুলে নমস্কার করা দূরে থাক, হা হা করে হেসে ওঠে সুকান্ত। বলে ওঠে, "সুগা খাবা?"

সুভাষ মনে মনে চিন্তিত ছিলেন সারদার মৃত্যুসংবাদ কী ভাবে ভাঙ্গবেন ছেলের কাছে। তাই "মায়ে আসে নাই ক্যান?" এই প্রশ্নের বদলে হঠাৎ এইরকম অদ্ভুত প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে কেমন যেন হকচকিয়ে যান। "সুগা কি বস্তু?"

"সুগা জানো না? সুগা আমার সেল-এর দেওয়ালের চূণ!!" বলেই আবার সেই উচ্চকিত হাসি।

সুভাষ ও হীরা হতভম্ব হয়ে বসে থাকেন। খানিক বাদে হাসির প্রকোপ কমলে সুকান্ত নিজেই বলে, "বোঝ না? বিড়ি-সিগারেট ত জেইলে কিছুই নাই। খামু কি? দ্যাওয়ালে আছে অফুরন্ত চূণ··· আর আছে পোকামাকড়···হেইয়াই খাই!"

হীরা আর পারে না। দুহাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। সুভাষ তাকে থামাবার চেষ্টা করেও পারেন না। মুখ তুলে দেখেন, সুকান্ত ভেতরে চলে গেছে। সেদিনকার মতন ভিজিট শেষ!

বাড়ী ফেরার পথে এই আকস্মিক আঘাতে স্তম্ভিত শ্বশুর ও পুত্রবধূর মধ্যে কোনও কথার আদানপ্রদান হয় না। বাড়ী ফিরে একঘটি করে জল খেয়ে যে যার শুয়ে পড়েন। হীরার ঘুম আসে না। সে প্রতিজ্ঞা করে তাকে জানতেই হবে কী করে সুকান্তর এমন মস্তিষ্ক-বিকৃতি দেখা দিল। এমন কী অত্যাচার করেছে জেলের পিশাচেরা যে তার এত বুদ্ধিমান, নির্ভীক, সংকল্পে দৃঢ় স্বামীর আজ এই অবস্থা?

পরের দিন থেকেই হীরা গোপনে খবর সংগ্রহের চেষ্টা চালায়। জানা যায় সুকান্তর সঙ্গে আরও কিছু রাজবন্দীকে দমদম সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এঁদের মধ্যে আছেন সুধীর আইচ, নলিনী দাস প্রমুখ নেতারা, যাঁরা সুকান্তর অন্তরঙ্গ বন্ধু। এঁদের সঙ্গে জেলে গিয়ে সোজাসুজি দেখা করা সম্ভব নয় তাই এঁদের আত্মীয়স্বজন মারফৎ তার প্রশ্নের কিছু কিছু উত্তর হীরা পেয়ে যায়।

সে জানতে পারে, সুকান্তর মনের বিপ্লবের আগুন ইংরেজ শাসকেরা আন্দামান জেলের অন্ধ খুপরীতে তাকে নিক্ষেপ করে নেভাতে পারেনি। জেলে থাকাকালীন প্রতিপদে বিদ্রোহ করেছে সে – সবরকম অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে, পরিণাম ভালো হবে না জেনেও। অনশন ধর্মঘটগুলির হোতাও বিশেষভাবে ছিল সে'ই। যখন প্রথম অনশনের মাসাধিককাল পার হয়ে গেছে, রাজবন্দীরা যখন প্রায় সকলেই দেহে-মনে জর্জরিত, শরীর অত্যন্ত দুর্বল, প্রায় মৃত্যুপথযাত্রী এবং তখনও ইংরেজ গভর্ণমেন্টকে একবিন্দুও টলানো যায় নি, তখন একদিন জেলের সুপারিন্টেডেন্ট সুকান্তর সেল-এর সামনে দিয়ে টহল দিচ্ছিলেন।

এইখানে বলে রাখা ভাল যে যাতে অনশনের দরুণ বন্দীদের মৃত্যু না ঘটে, সেজন্য প্রথমে নাকে নল ঢুকিয়ে দুধ খাওয়াবার চেষ্টা চালানো হোত। তাতে ফুসফুসে দুধ

ঢুকে মৃত্যু হবার সম্ভাবনায় শেষের দিকে পানীয় জলটুকু পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিল পিশাচেরা। তার বদলে বাটিতে করে দুধ রেখে দিত সেলের ভেতরে – আশা – তৃষ্ণার জ্বালায় বন্দীরা সেই দুধ খেতে বাধ্য হবে আর দুধের পুষ্টি তাদেরকে প্রাণধারণের ন্যুনতম রসদ জোগাবে - মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনবে। রাজবন্দীদের মৃত্যু ইংরেজ শাসকদের কাম্য ছিল না কারণ তাতে দেশে-বিদেশে তাদের প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা। এদিকে সুকান্তর নির্দেশে রাজবন্দীরা সেই দুধের বাটিতে প্রস্রাব করে রেখে দিতেন যাতে কিছুতেই, এমনকি ভুল করেও, তা খেয়ে না ফেলেন।

সুকান্তকে জাগ্রত দেখে অনশন-ক্লান্ত, মৃতপ্রায় মানুষটিকেও অপমান করবার লোভ সেদিন জেল সুপার সামলাতে পারেননি। বলে উঠেছিলেন, “সো! দ্য মিল্ক টেস্টেড সো গুড দ্যাট ইয়ু আর স্টেয়িং আপ ফর মোর?!”

শুনে ক্রোধে অন্ধ সুকান্ত সেই প্রস্রাব মেশানো দুধের বাটি জেল সুপারের গায়ে ছুঁড়ে মারে। সুপার উচ্চস্বরে অর্ডার দেয়, “বাঁধো উসকো!” চারজন মুস্কো জোয়ান গার্ড এসে সুকান্তকে তার নিজের সেলের মেঝের ওপর পেড়ে ফেলে। আশপাশের সেলের বন্দীরা বোঝে এইবার চলবে জোর করে নাকে নল ঢুকিয়ে দুধ খাওয়ানো। জোর করে কিছু খাওয়ানো হয়ও তাকে। তারপর বন্ধন খুলে দিয়ে পরিশ্রান্ত সুকান্তকে মেঝের ওপর ফেলে রেখে গার্ডরা বিদায় নেয়। এর কয়েক মিনিটের মধ্যেই সুকান্তর কাতর আর্তনাদ ও প্রচন্ড বমনের আওয়াজে অন্যান্য বন্দীরা তাদের নিজেদের সেল-এর মধ্যে শিউরে ওঠে। সবাই বোঝে সুকান্তকে দুধের বদলে খাওয়ানো হয়েছে অত্যন্ত কড়া কোনও জোলাপ··· অনশনের তখন পঁয়ত্রিশতম দিন!

এইরকম আরও অত্যাচার ও ঘাত-প্রতিঘাতের কথা ক্রমশঃ জানতে পারে হীরা। বিশেষতঃ সেলুলার জেলের প্রধান চিকিৎসক টড সাহেবের সঙ্গে সংঘাত এবং তার ফলস্বরূপ বেত্রদন্ডের কথা জেনে চোখে জল রাখতে পারে না সে। টড সাহেব নাকি প্রায়ই পাষন্ডের মতন ঘোষণা করতেন, “রাজবন্দীদের আমি ঘৃণা করি কারণ এরা আমার ভাইদের মৃত্যুর কারণ।” এর প্রতিবাদে সুকান্ত একদিন বলে বসেছিল, “আর তোমরা যে দুশো বছর ধরে প্রতি মুহূর্তে শত শত ভারতবাসীকে পাশবিক প্রক্রিয়ায় হত্যা করছ, আমাদের মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করছ, আমাদের দেশের সম্পদ লুন্ঠন করছ, ভারতীয় মহিলাদের উপর বলাৎকার চালাচ্ছ, আমাদের রক্ত শোষন করছ, তার সাজা দেবে কে?”

এর উত্তরে টড সাহেব সুকান্তকে একটি চড় কষিয়ে দেন। সুকান্তও ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। সেও পালটা চড় কষায়। শুরু হয়ে যায় মারপিট। সুকান্তকে সমর্থন করতে এগিয়ে আসে প্রবীর গোস্বামী, সুধেন্দু দাশ ও চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য। এদের চারজনেরই তাই কুড়িটি করে বেত্রদন্ড সাজা হয়। এই বেত্রদন্ডের ব্যবস্থা প্রায় মধ্যযুগীয়। সাধারণ কয়েদীদের মধ্যে সব চাইতে শক্তিশালী ও নির্দয় একটি লোককে বেশ করে খানিকটা তাড়ি গেলানো হয়। দন্ডিত কয়েদীদের নগ্ন করে একে একে দাঁড় করানো হয় একটি দেয়ালের দিকে মুখ করে, যে দেয়ালের গায়ে লোহার আংটা লাগানো আছে। কয়েদীদের দুটি হাত এই আংটার সঙ্গে কষে বাঁধা হয়। পায়েও লাগানো হয় লোহার বেড়ী। এইবারে দন্ডদাতা কয়েদী হাতে শঙ্করমাছের চাবুক নিয়ে রণহুঙ্কার ছেড়ে দূর থেকে ছুটে এসে আঘাত করে বন্দীর নগ্ন নিতম্বের ওপর – প্রতিটি আঘাতে মাংস কেটে উঠে আসে। কুড়িটি আঘাতের পরে যে কোনও সুস্থ মানুষও কয়েকদিনের জন্য চলৎশক্তিরহিত হয়ে পড়ে এবং হাসপাতালের শরণাপন্ন হতে হয়।

হীরা সিদ্ধান্ত নেয়, যেমন করে হোক সুকান্তকে এই বন্দীদশা থেকে মুক্ত করতেই হবে। কিন্তু আড়ালে চোখের জল ফেলা ছাড়া তেমন কোনও উপায় খুঁজে পায় না। একেকবার ভাবে বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়ে সংগ্রামের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লে কেমন হয়? পরক্ষণেই খেয়াল হয়, সে ছাড়া বৃদ্ধ শ্বশুরকে দেখাশোনা করবার কেউ নেই।

দিন কাটতে থাকে। হীরা টেরও পায় না পাড়ার বখাটে ধনীপুত্র তপনের সঙ্গে কবে বা কেমন করে একদিন তার স্বাভাবিক কথাবার্তা শুরু হয়ে যায় – এবং কী করে বা কবে থেকে এমন দাঁড়ায় যে তপনের সঙ্গে দিনে অন্ততঃ একটিবার দেখা বা কথা না হলে তার মনে হতে থাকে দিনটা বৃথাই কাটল। এই ব্যাভিচারিতার জন্য সে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে - জিজ্ঞাসা করে কেন তিনি তাকে এই প্রবৃত্তি দিলেন এবং এ থেকে মুক্তির উপায় কী। আজকালকার দিনের যে কোনো মনোস্তত্ত্ববিদ হীরাকে বুঝিয়ে দিতে পারতেন যে তার জীবনে লক্ষ্যের অভাব, দাম্পত্যজীবনের স্বাদগ্রহণের ও সন্তানাদির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং প্রবল একাকীত্বই তাকে তপনের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। পৃথিবীতে তপনই একমাত্র লোক যে হীরার প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করেছে, তার জন্যে চিন্তা করেছে, তাকে প্রচুর সময় দিয়েছে।

এরই মধ্যে একদিন হীরা জানতে পারে যে তার স্বামীর মুক্তি আসন্ন। বছরদুয়েক আগে হলেও এ খবরে হীরা উল্লসিত হয়ে উঠত। আজ তার প্রাণের ভেতরটা কেমন একরকম শূন্যতায় ভরে যায়। একটি বৃদ্ধের পরিচর্যায় এতাবৎ দিন কাটছিল, এখন একটি উন্মাদ এসে জুটবে তার সঙ্গে? নিজের চিন্তাধারায় নিজেই শিউরে ওঠে হীরা।

যথাসময়ে সুকান্ত ছাড়া পায়। বাড়ীতে আসবার পর তার সর্বক্ষণ ঝিমানি, খাদ্যে অনীহা, প্রবল কাশি, ইত্যাদি লক্ষ্য করে হীরা সাব্যস্ত করে তার স্বামী বহুদিন জেলে থাকার দরুণ অসুস্থ, অতএব তাঁর যত্নের প্রয়োজন। কিন্তু ভাল পথ্য এবং উদয়াস্ত সেবা-শুশ্রুষায়ও যখন সুকান্তর অবস্থার কোনও উন্নতি দেখা যায় না, তখন হীরা উদ্বিগ্ন হয়ে ডাক্তার ডাকে। বৃদ্ধ অবনী ডাক্তার গ্রামের চিকিৎসক হলেও হাতুড়ে নন। দেখে শুনে হীরাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেন, “টি বি” – হীরার পৃথিবী দুলে ওঠে। মাসদুয়েকের মাথায় মারা যায় সুকান্ত। হীরা ততদিনে তার শরীরের ভিতরে অপর একটি প্রাণের স্পন্দন অনুভব করেছে।

এরপরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত ও আরও মর্মন্তুদ। সুকান্তর পিতা সুভাষ দাশগুপ্তের এতদিন এতকিছু সহ্য হলেও, পুত্রশোক সহ্য হয় না। হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি পরলোক গমন করেন। হীরাকে অগত্যা ফিরে যেতে হয় তার বাপের বাড়ীতে – যেখানে তার পিতা-মাতার মৃত্যুর পরে দাদা পান্না ও বৌদি মালিনীরই একচ্ছত্র আধিপত্য। সোনার বিবাহের পরে সে থাকে তার শ্বশুরবাড়ীতে, আর মানিকের স্থায়ী বসবাস তার চাকরীস্থল রংপুরেই।

দাদার অবহেলা ও বৌদির ঠেস দেওয়া কথায় দুঃখে, অপমানে চোখের জলে দিন কাটে হীরার। এদিকে তপন অস্থির হয়ে ওঠে। দুক্রোশ পথ হেঁটে প্রতিদিন দেখতে আসাও সম্ভব নয়। তাই সে হীরাকে পালিয়ে গিয়ে বিবাহের জন্য চাপ দিতে থাকে। বিধবা-বিবাহ যদিও ততদিনে শহরে চালু হয়েছে, কিন্তু গ্রামে-গঞ্জে তার নজির মেলা ভার। তপনের বিশ্বাস তার বাপের টাকা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি গ্রামের লোকের মুখ বন্ধ রাখতে মন্ত্রের মত কাজ করবে। তাছাড়া, হীরার সন্তানসম্ভাবনার কথা এখনো গ্রামের কেউ জানতে পারেনি। তাই লোক জানাজানির আগে এই ত সুবর্ণ সুযোগ! তপন এও বলে যে সেরকম বেকায়দা দেখলে তারা না হয় অন্য দূরের কোনও গ্রামে পালিয়ে যাবে কিছুদিনের জন্য – যেখানে তাদেরকে কেউ চেনেনা।

অগত্যা একদিন রাতে সর্বাঙ্গ কালো চাদরে মুড়ে বাড়ী থেকে পালায় হীরা। ছিছিক্কারে দেশ ভরে ওঠে। পান্না ও মালিনীর বাড়ী থেকে বেরনো দায় হয়ে ওঠে। মালিনী পাড়া জাগিয়ে লোকদেখানি বুকফাটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে, আর পান্না সরবে সর্বসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করে যে চরিত্রহীনা কুলটা ভগিনীর দেখা পেলে সে তাকে নিজের হাতে গলা টিপে হত্যা করবে। কিছুদিন খানাতল্লাসী চলে কিন্তু অচিরেই ব্যাপারটি ধামাচাপা পড়ে যায়।

এরও মাসছয়েক পরেকার কথা··· সোনা সেই সময়ে ইস্কুলের ছুটিতে মেয়েকে নিয়ে বাপের বাড়ী বেড়াতে এসেছে। ভোরের দিকে খবর এলো, নারায়ণগঞ্জ থেকে

আগত বরিশাল-এক্সপ্রেস ট্রেনে কে এক মেয়েলোক কাটা পড়েছে। জানা গেল, মেয়েটির মুখচোখ থেঁতলে গেছে, সনাক্ত করা যাচ্ছে না তাই পুলিশ ট্রেন স্টেশনের কাছাকাছি এলাকাগুলির বাসিন্দাদের অনুরোধ করছে ঘটনাস্থলে গিয়ে লাস সনাক্ত করার কাজে তাদেরকে সাহায্য করতে। খবর শুনেই সোনা ঠিক করে ফেলে যে সে মৃতদেহ দেখতে যাবে। সাধারণতঃ লাজুক ও ভীরু স্বভাবের মেয়ে সোনা আজ হঠাৎ এ বীভৎস দৃশ্য দেখতে যাবার সাহস কোথা থেকে সঞ্চয় করে, বোঝা যায় না। তাকে যেন কেউ তাড়িয়ে নিয়ে চলে। কাউকে কিছু না বলে সে হুট করে স্টেশনের উদ্দেশে রওনা দেয়।

সোনা যতক্ষণে গিয়ে পৌঁছয়, মৃত মেয়েটির মুখখানি ততক্ষণে পুলিশ কালো কাপড়ে ঢেকে দিয়েছে। সোনা দেখে শরীরে সন্তান-সম্ভাবনার চিহ্ন সুস্পষ্ট। অনেকক্ষণ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে। ডান হাতটি এলিয়ে থাকায় প্রথমটায় দেখতে পায় নি কিন্তু পরে লক্ষ্য করে অনামিকায় একটি আংটি – তাতে জ্বলজ্বল করছে এক বার্মিজ রুবি – ঠিক যেন তার ঠাকুমার আংটিটি। উদ্গত অশ্রুদমনের চেষ্টায় প্রায় দৌড়ে সরে আসে ঘটনাস্থল থেকে সোনা। রাস্তা ধরে ছুটতে শুরু করে – কান্নায় তার কণ্ঠ দিয়ে থেকে থেকে শুধু চাপা গুমরানি বেরিয়ে আসে। লোকালয় থেকে অনেকটা সরে এসে শেষ পর্যন্ত একটা শিশু গাছের নিচে আছড়ে পড়ে সে – বুকের ভেতর থেকে এক আর্তনাদ বেরিয়ে আসে – “দিদি রে! পোড়ার মুখী, একটি দিনের তরেও সুখের মুখ দেখলি না!” ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে সোনা – ধরা গলায় বলতে থাকে, “দিদি রে, এ তুই কী করলি?”

[স্বাধীনতা সংগ্রামী নলিনী দাসের “দ্বীপান্তরের বন্দী” গ্রন্থখানি থেকে সত্যঘটনাগুলির বিবরণ সংগৃহীত]

Personal Reminiscences of a Tragic Period: August 1946 – August 1947 in Kolkata

Mainak Mazumdar

The decade of the 1940's was a terrible time for the whole of Bengal. First there was the World War. It was followed by the great Bengal Famine in which millions of people perished. As an aftermath to the Quit India movement thousands among the Bengali youth were unfairly detained or imprisoned. It was a witness to violent communal riots amongst which the Great Calcutta Killing of 1946 comes out supreme. There was the tragic partition of Bengal which uprooted he lives of many and the effects of which are still being felt today. Many of the readers of this magazine are perhaps too young to have seen these events. I have here chosen a particular period within this decade; the year between August 1946 and August 1947 and will describe very briefly what I remember as a young boy of 11 years about this horrible period which however ended in a happy note with the freedom of India.

In my childhood and throughout my teenage years I lived in Dharmatala Street at one corner of the Wellington Square where many important political meetings were held. Our home was less than a mile away from Esplanade, the heart of Calcutta, the central place for all kinds of agitations. From a balcony of my home, I could see the processions, the reactions of the police and sadly at times the movements of the rioters. The Sealdah railways station was also not far off and so I could see when I ventured out, the flood of the refugees coming from different parts of East Bengal.

After the Second World War ended, I believe the British Government had not quite decided whether to leave India, grant independence or to stay ruling the country as an imperial power. At the same time, there were severe economic problems in its own country and constant American pressure to grant its colonies independence. I was a witness to the last remaining throes of the colonial power trying to exert its might to the ruled citizens.

In the mid1940's the British Raj still lay supreme. Because of the Communal Award criterion behind the British made Indian Constitution, for provincial elections, only Hindus could vote for Hindu candidates and the Muslims could vote for Muslim candidates. Thus. Bengal being a Muslim majority state, the Muslim League was the majority party and ran the government. Although Calcutta's nationalistic oriented and politically aware middle class which was predominantly Hindu, bore some resentment towards the provincial Government, its predominant anger was directed towards the British Government. People's attention was focused on major events like the trials of the Indian National Army (INA) officers on grounds of treason and questions like whether Netaji Subhas Chandra Bose was still alive or not.

I remember that when I was young, I heard the word Pakistan mentioned sometimes. But my adult relatives did not take the idea seriously. They thought it was a wild idea advocated by several Islamic newspapers. Jokingly they said, "*haathe bidi mukhe paan, larke lenge Pakistan.*" Even in early 1946, there was little realization in my family that hailed from East Bengal what Pakistan was and what it could mean. When a violent movement in the shape of the Great Calcutta Riot broke out for the immediate creation of Pakistan, everyone among my relatives was shocked and shaken up. Here is what a

French writer, Claude Markowitz, in the introduction to his article about the riots wrote: "'The Calcutta riots of 1946, also known as 'the great Calcutta Killing' were four days of massive Hindu-Muslim riots resulting in 5,000 to 10,000 dead and some 15,000 wounded, between August 16 and August 19, 1946. These riots are probably the most notorious single massacre of the 1946-47 period during which large scale violence occurred in many parts of India. However, the "Great Calcutta Killing" stands out somewhat in the history of Calcutta given that it was the deadliest episode in its recent past."

In early 1946, the British Prime Minister, Clement Attlee announced that it was his government's intention to transfer power to Indian nationals. He did not then specify the date on which such a transfer would take place. The two major Indian parties, the Congress and the Muslim League, which would be involved in future power sharing, had very different ideas regarding the future shape of the subcontinent. In 1940, the Muslim League passed a resolution in favor of the creation of Pakistan. In May 1946, a British Cabinet Mission proposed a plan for the formation of an interim government composed of the representatives from the Congress, the Muslim League, and other forces to plan for such a transition. It was not clear whether India would remain a federation with its states being governed by different parties or India would be divided to make room for a Muslim majority nation. This plan for the Interim Government gave the Congress one more seat than the League. After weeks of negotiation, at the prompting of its president, Mohammed Ali Jinnah, the plan was rejected by the Muslim League. It further called on Muslims throughout India to observe a "Direct Action Day" on August 16, 1946 for the division of India and the creation of a Muslim majority country called Pakistan Apparently, this call was for peaceful demonstrations and most of India, including the Muslim majority provinces of the Punjab and Sind remained calm. But in Bengal and especially in Calcutta the protests turned especially violent and took a nasty turn.

According to the version with which I am familiar the chief culprit for the disturbances was Mr. Hussain Suhrawardy, the Chief Minister of Bengal. He had a large, devoted following among the Urdu speaking poor Muslims who formed a majority of Calcutta's Muslim population. The Bengali Muslims who formed a religious majority lived mostly in the East and the rural areas. The city itself was also deeply geographically segregated. There were pockets of Muslim concentration in parts of Central Calcutta while the Hindus dominated North and South Calcutta. Our home was situated on a border between these two groups. To our north it was mostly Hindus and to our immediate south the residents were mostly Muslims. Thus, I was a witness to some of the activities of both these communities. It is alleged in many responsible quarters that it was Suhrawardy's actions that gave violence a free rein on August 16 and its aftermath. In a meeting held in the Maidan a day before the Direct Action Day, Suhrawardy told the Muslim League crowd that he had taken steps to restrain the police the following day. This was interpreted by the crowd as a license to loot and kill. He also positioned himself in the police control room during the day of the agitation to take complete control of the police responses to the rioting and violence. Of course, there are many supporters of him who claim that he acted appropriately.

I have vivid recollections of what happened in front of our home on the day of Direct Action. From the morning riotous mobs poured in from all sides threatening passersby. Although we usually saw police presence whenever a procession passed by, we did not see on that particular day a single policeman on the street. We heard rumors to the effect that innocent people were being attacked and looting was taking place in the central districts. Everyone in our neighborhood was surprised and shocked.

As the evening darkness settled in, we could hear from our home cries of ‘Allahu Akbar.’ The situation was very scary and tense indeed. After an initial shock, the Hindu community who lived on the opposite side of our home came back in full force and started retaliating. I have a feeling that the violence was not only confined to the so- called goondas but it spread to perfectly respectable people who thought it was their duty to protect their communities and their families. The rioting stopped after the Military was called in after a few days. But the trust was totally lost between the two communities. Sporadic violence, occasional stabbing of innocent pedestrians continued for a year in Calcutta until the Independence Day the next year. I remember a particular incident that directly involved our family. A few months after the Direct Action Day, the Shia Muslims celebrated the Muharram festival. It was their custom to take huge processions during the night and enact the fights that took place in the past between their prophets Hasan and Hussein and their enemies. That night the procession went in front of our home. Suddenly the procession was stopped, and all the participants sat on the streets loudly proclaiming that they were stone throwers who were hiding on the roof of our apartment building and showering them with stones. A little later we heard loud knocks on our front door. We had no means of verifying their claim. We were all very scared of course, but after the knocks continued for some time, my father decided to open the door and see what the crowd demanded. To our relief we found that it was a few police officers who stood at our doors. They wanted to inquire if we had any role in the incident that aggravated the people in the procession. After they were satisfied that we were innocent they left our premises and the procession departed peacefully. There was a comical ending to this incident. A few months later we found in the newspaper that all the residents of our apartment building had been levied a collective fine of a nominal amount by the police for having created a disturbance to a religious ceremony. I do not remember if we paid the fine. To my knowledge no book has appeared that exclusively describes the Direct Action Day and its ramifications.

The Direct Action Day has great political and historical significance. Until this day the idea of partitioning India and creating a second country called Pakistan was unthinkable to the leaders of the Congress. But the violence demonstrated during the riots must have led them to change their minds. I believe they must have concluded that if India were to attain freedom for the sake of peace it might be wiser to agree to the league’s mission and grant them their demand of a separate Muslim country named Pakistan. The violence in the country did not stop after the Calcutta riots. There was great rioting and violence towards the minority Hindu community in the Noakhali region in East Bengal. Gandhiji tried to stop the violence by visiting Noakhali and staying there with a message of peace. It cannot be said that he was very successful in his mission. Thereafter the Congress party formally accepted the partition of India. After the Congress party’s decision to accept the partition of India intense political maneuvering started from all sides to get the best bargain possible. An interim government was formed consisting of five Congress party and Muslim League members. Its job was to assist the transition from the colonial government to the national governments. Although the Congress party got the important portfolios such as External Affairs and Home, the finance portfolio got to Liaquat Ali Khan, a member of the Muslim League. I have read later that he raised objections to all the proposals that the Congress party brought for go0vernment expenditure. That must have reinforced the notion that it would be impossible for the two contending parties to work together amicably in the future.

During this interim period, it was agreed that the two provinces, Bengal and Punjab would

also be divided into two parts, one going to India and the other going to Pakistan. A commission was appointed to oversee the partition. It was headed by Lord Radcliffe who had never visited India previously. His decision was announced two days after the Independence Day. The so-called Radcliffe award led to creation of two separate entities from the Bengal province, West Bengal that would belong to India and East Bengal, which would belong to Pakistan. Eventually the partition would give rise to massive refugee problems in both Punjab and Bengal. It would also unleash unimaginable violence with which the reader must be familiar.

All these gloomy happenings of violence and distrust were forgotten at least temporarily on the Independence Day, when we were all awash with joy at the reality of India having gotten its much cherished freedom. There were the processions of cheering crowds all over Calcutta. I joined the crowds.

Coming to Esplanade I found that the doors of the Governor's mansion have been opened and anyone could now go inside and visit the rooms inside. Along with the crowd I went inside the mansion. The size of the crowd was so big that I could not have a good look at what was inside. But I had the satisfaction of having been there.

Contributions by Two Foreign Nationals Toward Indian Educational System and Independence Movement

Sankar P. Basu

India has been amidst its celebration of 'Azadi ki Amrit Mahotsav' or 75th anniversary of Independence, which started in March 2021 and will continue until August 15 of 2023. This 'Azadi' did not come through easily—- not without a hefty price. Many precious lives had to be lost as martyrs, many sacrifices had to be made by young illustrious sons and daughters of India. Mangal Pandey, Bhagat Singh, Lala Lajpat Rai, Kshudiram Bose, Prafulla Chaki, Jatin Mukherjee (aka Bagha Jatin), Pritilata Waddedar, Surya Sen, Binoy Basu, Badal Gupta, Dinesh Gupta, Matangini Hazra, to name a few, were among those who were thrown either into gallows or shot brutally by the British Army. We remember these selfless freedom fighters and bow down our head with reverence on the platinum jubilee year of India's independence.

This account on Indian Independence is not, however, written to highlight the sacrifices made by the native Indians mentioned above, but more so to highlight the significant and unanticipated contributions made by two foreign nationals, e.g., a woman of Anglo-Irish descent, Margaret Elizabeth Noble, known as Sister Nivedita (1867–1911) and another Englishman, Charles Freer Andrews (1871-1940) commonly known as Deenabandhu Andrews[1]. Both laid down their lives for the cause of serving India and never returned to their land of birth, breathing their last in Darjeeling and Calcutta, respectively.

I. SISTER NIVEDITA

Sister Nivedita was born into a family of revolutionaries. Her grandfather, John Noble, her father, Samuel Richmond, and her maternal grandfather, Hamilton, were in the forefront of the Irish freedom struggle. Completing her education in Halifax in Northern Ireland, Nivedita took to teaching for ten years from 1884 to 1894. During the later part of this period, she met the famous revolutionary, Prince Kropotskin. Thus, she had an early exposure to conducting revolutionary activities. While traveling in Kashmir with Swami Vivekananda, she observed the British government refusing to grant permission to the Maharaja of Kashmir to hand over a piece of land to her guru for setting up a Mission and a Sanskrit College. Her Irish blood revolted, and she realized that the emancipation of India and regeneration of Hinduism could be achieved only by putting an end to British rule in India.

On returning to Calcutta, Sister Nivedita stayed for a week with Holy Mother, Sri Sarada Devi, and later shifted to the house at 16, Bosepara Lane, in Baghbazar area of

[1] The name Deenabandhu was given by Rabindra Nath Tagore while Gandhiji fondly named him as Christ's Faithful Apostle (CFA)

Calcutta where Holy Mother performed the opening ceremony of Nivedita's school for girls on November 13, 1898.

In March 1899, when plague raged in Calcutta, Sister Nivedita organized a group of young men and engaged herself in relief operations. She was seen in every slum in the Baghbazar area with a broom stick in her hand, cleaning the streets when no sweepers and scavengers were available.

Nivedita efficiently responded to the challenges of the time in India. She came to India as Swami Vivekananda's disciple in 1898, developed oneness with the cultural ethos, immersed herself in a variety of activities related to public life, and furthered the cause of the Swadeshi movement. She met Swami Vivekananda in 1895 in London and travelled to Calcutta in 1898. Vivekananda initiated her into the vow of Brahmacharini on March 25, 1898. Although Nivedita's nationalist activities did create anxiety in the circles of the Ramakrishna order, Swami Vivekananda, on his part, allowed her to pursue the path she had chosen. However, after the death of Swamiji on 4th July 1902, the difference of opinion between her and Swami Brahmananda, the then president of the Ramakrishna Math, grew wider on the issue of Nivedita's participation in politics, culminating in her forced resignation from the mission.

It may seem unbelievable however, that she started encouraging the young Indian revolutionaries in every conceivable way she could, even sending people in disguise to the Chemistry laboratory of the Presidency College (then affiliated with the Calcutta University). She had secretly managed to 'smuggle' two young terrorists to try and make bombs during late hours of the college, working as assistants of Acharya Prafulla Chandra Ray and Acharya Jagdish Chandra Bose who were the professors in the Chemistry and Physics Departments respectively at the time. Both the professors were close to sister Nivedita but neither of them could apprehend this ploy of late night working in their labs to develop the blue-print of making bombs. Nivedita sent these boys to the government college knowing fully well that it was safe to work there to avoid suspicion. It could be that these two Indian Professors knew and had tacit support behind such activities! She also directly helped Barun Ghosh, the younger brother of Rishi Aurobindo Ghosh to make bombshell in the laboratory at Muraripukur Road, Calcutta. In addition, she sent one of the team-mates, Hem Chandra Ghosh, to France for learning bomb technology. But even before Hem Chandra's return to India, Ulhaskar Datta was carrying out some dangerous experiments to find means of making Melanite, an essential explosive in homemade bomb making. Besides aiding the revolutionaries in bomb making and conducting the terrorist activities aimed at uprooting the British Raj from India, she helped Jagdish Chandra Bose in academics by editing some scientific books and journal papers. She also advised him to patent his discovery on wireless radio wave propagation with the patent office in US before the Italian engineer, Marconi, could take credit of Acharya Bose's original discovery.

II. C. F. ANDREWS

Unlike sister Nivedita who came to Calcutta being influenced by the speeches on Vedanta by Swami Vivekananda, Andrews was sent by Cambridge Brotherhood Mission in England, to join St. Stephen's College in Delhi as the Principal of the college in 1904. Soon after setting his feet on Indian soil, he found himself among the poor and oppressed people of India. He noticed painfully how racial injustice and untouchability were disrupting India's social fabric. The division between people was against the principle of his religion. He met Sushil Kumar Rudra, an Indian Christian who was then the Vice-Principal of the college. After meeting Mr. Rudra, Andrews declined the offer for the post of Principal, saying that Professor Rudra was far better qualified for this appointment, and he would have no objection to working for him. He had a hard fight to convince the managing committee, but in the end, they accepted his recommendation. "Thus, my father became

the first Indian head of St Stephen's College and Andrews stayed on under my father on the staff", writes Prof. Rudra's son, Major Ajit Anil Rudra in his memoir of Andrews.

Andrews met the poet Rabindranath Tagore for the first time in England at the home of painter and artist William Rothenstein in June of 1912. He heard there the writings of Tagore from the book, Gitanjali, read by the poet W.B. Yeats. The poetry of Tagore moved him and breathed peace in his troubled soul. It was a night of "inner illumination" for him which made him utter in ecstasy, "On the seashore of the world where the children meet", he could not return to his home that night and the poems that he heard kept resonating in his ears without a break until the dawn appeared on the following day.

DAYS IN SANTINIKETAN

It was in April 1914, Andrews joined Santiniketan as a permanent member of the staff. Before that he had occasionally visited the place, and even had been fascinated by the personality of Tagore. With him came William Pearson, another highly educated Englishman, an intimate friend of Andrews, who had been working as a resident tutor with a well-to-do family in Delhi. In a letter written to Tagore on July 28, 1913, Andrews longed to come out of the bondage of narrow missionary society and give his "whole love and affection to India herself and live the true Christian life in doing so." After he had met Rabindranath, a profound change came over him. It was, as it were, love at first sight, and he accepted Rabindranath as his Gurudeva and became a devoted follower for life. In these two kindred souls we find the meeting between the East and West. In the poem composed on his arrival at Santiniketan the poet received him with these words:

"*From the shrine of the West*
You have brought us living water,
We welcome you, friend
The East has offered you her garland of love."

Andrews then decided to give up his position of Vice Principalship of St Stephen College and dedicate his life to the service of Santiniketan institution.

Andrews was popular among the students as their English language teacher. In one of his memoirs, Mr. Pramatha Nath Bishi, the then student of the institution wrote,

"When English composition was examined by Andrews, he marked and corrected only a few mistakes. This gave us confidence. But when the task fell on Indian teachers, the result was a blank despair for us: the written pages were scored with red ink all over." Another contemporary student, Mr. Kalipada Roy, worthy son of the teacher, Mr. Nepal Chandra Roy, who was a student of Class Seven at the time, in his reminiscence told this author that once after the summer vacation was over, Andrews decided to stage the Shakespearean play, "Merchant of Venice", and taught the younger students close to Kalipada Roy's age. It was amazing to see the amount of energy Andrews could spend with the boys with persistence and perseverance throughout their training and rehearsal of the play. One of his classmates, Pramatha Nath Bishi, acted in the role of Shylock, Mr. D.M. Sen, another of his friend who later became D.P.I of West Bengal and subsequently, the Vice-Chancellor of Burdwan University, acted in the role of Bassanio, and Kalipada Roy himself, acted in a small role of Gratiano. In December1914, after the Christmas, the play was successfully staged at the auditorium in Santiniketan (private

conversation between the author and Late Kalipada Roy in 1980).

A few days after Andrews and Pearson came and settled at Santiniketan the news started pouring that Gandhiji had been waging his classical non-violent fierce struggle of Satyagraha with the South African Government. Being advised by Mr. Gokhale they went to South Africa to see things there with their own eyes. Andrews came to pay respect to Gandhiji and Gandhiji too liked him. Thus, Andrews became the link between Gandhi and Rabindranath.

TOUR OF SOUTH AFRICA AND FIJI

Andrews felt that British rule was stunting Indian development, and, consequently, he threw his support behind the Indian National Congress. As early as in 1912, he declared that he would look forward to the day when India would be 'really independent', a statement which brought charges of treason from his compatriots and earned for him in the Indian police files a description as 'sentimental agitator'.

He was concerned about the exploitation of Indian labor in many parts of the British Empire. During 1913 he personally called the Viceroy's attention to the conditions of Indians in South Africa, and in the following year he went out to Natal to assist Gandhi in the struggle he was leading against discriminatory legislation. At about this time came about a truce in the South African struggle with Gandhiji and Dr. Smuts, the South African premier.

It was a similar mission that brought him to the South Pacific in 1915. Reports reaching India from Fiji indicated that Indian workers on the Colonial Sugar Refining Company plantations were being badly treated. Andrews made a tour of the recruiting centers in India, and the flagrant abuses in the system of indenture which his enquiries revealed convinced him that he should go to Fiji to see for himself what was happening there. He left India early in October bound for Australia and New Zealand, where he was to have preparatory talks with officials of the Colonial Sugar Refining Company and senior members of the two governments.

CONVOCATION ADDRESS IN CALCUTTA UNIVERSITY
:

In March 1938, Dr. Shyama Prasad Mukherjee, Vice Chancellor of Calcutta University, invited Andrews to deliver convocation address to the graduating students. He emphasized in his address on developing creative and independent thinking of the students and develop better understanding, love and friendship between students and teachers. In his convocation speech, this author would like to append below, a few excerpts in the paragraphs that follow:

"*Chancellor, Vice-Chancellor, and Friends,*
You will pardon me today if I speak chiefly to those who are students; for my whole life has been spent in the student world, among the young, and I have a deep love for them which seeks to find its utterance at a time like this in the hope that some word of mine may cling to their memories long after Convocation Day is over…………

When I look back on my own undergraduate days at Pembroke College, Cambridge, the one permanent and abiding thing that made all the difference to me, was the profound reverence I had for my Tutor, Charles Herman Prior. He let me enter into his own inner life and shared his deepest thought with me. His friendship was my inspiration. Along with him was one who became our President, Sir George Gabriel Stokes[2]* the greatest man of science in his own generation, whom men like Lord Kelvin*[3]** *used to call their Master. He was completely*

---

[2] George Stokes discovered the law on viscosity in Physics, known as Stokes' Law.

[3] Lord Kelvin was a Physicist who did fundamental works in Heat and Thermodynamics, established absolute zero of temperature and a scale of measurement goes by his name.

unselfish and would give to his pupils freely his own fruitful thoughts, in order that they might get the world's praise rather than himself. The undergraduates used to call him, "Angel Gabriel". …..

At this point, I would also record my strong conviction that Sir Asutosh Mukherjee, one of the outstanding Vice-Chancellors of recent times had the genius to see that in the higher branches of research these ideal conditions between teachers and taughts could be repeated in this university, at least among the most brilliant students……..

Here also, Sir Ashutosh's wise direction, in the conduct of higher research work, whether in literature, philosophy, or science, Calcutta University has refused to be provincial. It has chosen its teachers from every part of India, and from other lands: for human knowledge knows no local boundaries. The word 'University' itself implies this, so now you are rightly proud to have here on your staff not merely from your own country of highest repute, but also such brilliant men as the Nobel Prize Winner, Prof, C.V. Raman, and the Oxford Professor of Eastern Religion and Ethics, Professor Radhakrishnan, both of whom have been invited to come to Calcutta from the South."

III. CONCLUDING REMARKS:

Both Sister and Deenabandhu came to India at different times with similar purposes: to serve the poor and the helpless and educate the masses, remove superstitions, and bring unity. What they did not envision at the time was that they would have to fight for Indian Independence.

Before inviting her to come to India, Swamiji cautioned Sister Nivedita about the conditions prevailing in India and had serious doubts if she could stay in India and fulfil her missions. Deenabandhu, however, was not initially influenced by Rabindranath and came to India being ordained by a Christian Mission to join an academic institution.

Sister took an initiative to establish a school for girls in Calcutta and worked for the poor and distressed people stricken with deadly plague in the slum area. Deenabandhu took no time to realize the level of discriminations existing among the English toward the native Indians and plunged himself in Swadeshi Movement, meeting leaders like Honorable Gokhale, Mohandas Gandhi, Rabindranath Tagore, among others. As a result of his contact with Gandhiji, he was inspired by his ideologies of 'Non-violence' and 'Satyagraha' which exerted grave consequences on the re-thinking process of the British Raj.

Sister Nivedita, on the other hand, met a handful of Indian leaders besides Swamiji, which included personalities in different disciplines like Sir Jagadish Chandra Bose, Abanindranath Tagore, Acharya Prafulla Chandra Ray, Aurobindo Ghose, Barin Ghose, etc., and jumped on to violent activities to free India from the bondage.

There is a striking similarity between these two great leaders—despite being born outside of India, they both adopted India as their second home and fought for India until the very end of their lives.

References

1. "*Notes of Some Wanderings With Swami Vivekananda" By Sister Nivedita, published by Udbodhan, Calcutta*
2. *"Presidency Colleger Itibritta" By Biswanath Das, published by "Thema", Calcutta*
3. *"Rabi Pradakshin Pathe" By Somendranath Bose, published by Tagore Research Institute, Calcutta*
4. "*Notes of Some Wanderings With Swami Vivekananda" By Sister Nivedita, published by Udbodhan, Calcutta*

বিবিধ প্রসঙ্গ

মহিষাসুরমর্দিনী

অরুন্ধতী ঘোষ

আমরা যে দেবীকে পূজা করি, তিনি দশভূজা, বাহন সিংহ। সঙ্গে থাকে ছেলে -মেয়েরা। মা দুর্গা কিন্তু পূজিত হন ভারতের অন্যান্য জায়গায়। তবে সেখানে তিনি দেবী অম্বা, বাহন বাঘ এবং মহিষাসুর বধে রত নন। আমরা বাঙ্গালিরা এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ দশদিন ধরে মহিষাসুর দমনে রত দেবী দূর্গার পূজা করি আশ্বিন মাসে। তবে দেবী দুর্গার সঙ্গে ছেলে-মেয়ে নিয়ে যে দুর্গাপূজা হয়, সেটি বাঙ্গালির নিজস্ব। শোনা যায় কৃষ্ণনগরের রাজা এই দেবীমূর্তির (মহিষাসুরমর্দিনী ও সঙ্গে লক্ষী, সরস্বতী , কার্তিক, গণেশ সহ) এই পূজা শুরু করেন। তারপর থেকেই বাংলার অন্যান্য জায়গায় এই পূজা প্রচলিত হয়। ভারতের অন্যান্য জায়গায় যে নবরাত্রি উৎসব পালিত হয় দুর্গাপূজার সময়, সেখানে কিন্তু শুধু মহিষাসুরমর্দিনীর পূজা হয়। বেশ কিছুদিন আগে কর্ণাটকের হ্যালেবিড়ু শহরে ১২শ শতাব্দীর হয়সালেশ্বর মন্দিরের গায়ে আমি মহিষাসুর বধে রত দেবী দুর্গার কিছু খোদাই করা মূর্তি দেখেছিলাম। দেখে খুব ভাল লেগেছিল। কালের প্রভাবে একটু আধটু নষ্ট হলেও মহিষাসুরমর্দিনী বলে চিনতে কোনো অসুবিধা হয় নি।

হয়সালা সাম্রাজ্য দাক্ষিণাত্যের একটি বিশেষ সাম্রাজ্য ছিল একসময়ে। এরা মূলতঃ শিবের পূজারী (শৈব)। শিবের মন্দির হলেও এখানে শৈব ও বৈষ্ণব দুয়ের সমন্বয় দেখতে পাওয়া যায়। মন্দিরটি সোপস্টোন (সাজিমাটি) খোদাই করে তৈরী। মন্দিরের গায়ে অজস্র রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতপুরাণ থেকে নেওয়া তথ্যের চিত্র খোদাই করা আছে, শ্লোকও দেখতে পাওয়া যায়। কালের বিগতকালের বিভিন্ন যুদ্ধের সময়ে মন্দির, মূর্তি- ধ্বংসের হাত থেকে কোনোরকমে নিস্তার পেলেও কালের প্রভাব পড়েছে। তবুও এখনো যা অবশিষ্ট আছে সেই কাজ গুলি দেখতে দূর দূর থেকে মানুষ এই মন্দির দেখতে আসেন। এছাড়াও আছে অনেক মূর্তি। সেগুলি এককথায় অসাধারণ। দেবীপক্ষে এই ছবি দিয়ে মা দুর্গাকে প্রণাম জানালাম।

চোখের আলোয় দেখেছিলেম

বিকাশ দাশ

নানা মত নানা কথা -
বিচিত্র বিষয় নিয়ে বাক চাতুরতা
বিক্ষিপ্ত মনের এই বৃথা প্রশ্রয়
সময়ের অপব্যয় হয়।

নানা রীতি নানা নীতি
মনের গহনে জমা অতীতের স্মৃতি
অম্ল-মধুর -
নানা ছন্দে বাজে অবিরত
মোহনীয় কাল্পনিক সুর
গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে -
নীহারিকা ভেদ করে
চলি অনন্তের পানে
বাঙময় পৃথিবীটি ভেসে যায়
আলোর প্লাবনে।

ওই দেখো ক্ষুদে মেয়েটিকে -
ওর পবিত্র চোখে উপলব্ধি করো
পৃথিবীর আদি ছন্দ, আদি সংগীত।

তবু মনে রেখো -
মানসিক ওঠা নামা, বিপন্ন যত ভাবনা
এক লহমায় দূরে চলে যায়
স্থির চিত্তে চেয়ে দেখো –
প্রথম আদি শক্তি
অপূর্ব চোখে দ্যুতি ভরা
জগতের যত বিস্ময়॥

চন্দ্রপুলি

দেবাঞ্জন বিশ্বাস

ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরিতে তুলে আনা বইগুলো ফেরত দিয়ে, মেম্বারশিপ কার্ড সারেন্ডার করতে বেশ খানিকটা দেরিই হয়ে গিয়েছিল। দিনের আলো শেষ হয়ে ততক্ষণে সন্ধ্যা নেমে এসেছে শেক্সপিয়ার সরণিতে। এই অঞ্চলে আর বহুদিন আসা হবে না। আটচল্লিশ ঘন্টা বাদেই আমি নিজভূম ছেড়ে পাড়ি দেব মার্কিন দেশের এক অপরিচিত ছোট্ট শহরে নতুন করে পড়াশুনা শুরু করতে। নতুন পথে চলা শুরু করার আগে আজ আমার মনটা উত্তেজনায় তপ্ত, আবার তীব্র ব্যথায় শীতল। চারদিন আগে আমি হারিয়েছি আমার ঠাকুমাকে। ঠাকুমা ছিল আমার "মনের আরাম, প্রাণের আনন্দ"। মা'র শাসনের সামনে একা কুম্ভর মতো বুক চিতিয়ে ঠাকুমা রক্ষা করেছে আমার শৈশব ও কৈশোর, যা বিপন্ন করে তুলেছিল পাড়া প্রতিবেশীদের জীবন। চারদিন আগে ঠাকুমার সাথেই হারিয়ে গেছে ফেলে আসা আমার সেই উদ্দাম ছেলেবেলা। আমার মনটা যেন দেওয়ালে মাথা ঠুকে কাঁদছে কারণ তেরো দিনের মাথায় যখন ঠাকুমার পারলৌকিক কাজ হবে, তখন আমি পরবাসী। বিগত কয়েক মাস চাকরী করে জমানো আমার রোজগারের কিছু টাকা ব্যাঙ্কে রাখা আছে, ইচ্ছা তার সবটাই বাবার হাতে দিয়ে যাব ঠাকুমার শেষ কাজে খরচ করার জন্যে। কিন্তু বাবা মার তাতে তীব্র আপত্তি।

মা বলেছিল "কেন তুই টাকা না দিলে কি মা'র কাজ হবে না? টাকাটা জমিয়ে রাখ - পরে কোনও দিন তোরই দরকার লাগবে।"

কথাটা অযৌক্তিক নয়, কিন্তু আবেগ আর যুক্তি অধিকাংশ সময়েই একে অপরের সঙ্গে সহমত হয় না। হাঁটতে হাঁটতে এসে দাঁড়িয়েছি শেক্সপিয়ার সরণি আর চৌরঙ্গীর মোড়ে, বাস ধরে রওয়ানা দেব বাড়ির দিকে।

এসি মার্কেটের সামনে সাঁঝবেলার উজ্জ্বল আলোয় জায়গাটা ঝলমল করছে। পথ চলতি লোকের ফাঁক দিয়ে হঠাৎ নজরে পড়ল আমার থেকে প্রায় হাত পঁচিশেক দূরে চওড়া ফুটপাথের এক সুদূর কোণায় মাটিতে বসে আছেন এক বৃদ্ধা মহিলা, পরণে সাদা থান, সামনে একটা ডালা খোলা টিনের তোরঙ্গ। দূর থেকে দেখে ঠিক ভিখারি বলে মনে হয় না। প্রবাহমান জনস্রোতের মাঝে এই এক চিলতে স্থবিরতা আমাকে যেন মনোযোগী করে তোলে। ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাই সেই বৃদ্ধার দিকে। খানিক দূর থেকেই বুঝতে পারি যে চারপাশের জনারণ্যের দিকে তাঁর নজর নেই, ঘাড় গুঁজে তিনি তাকিয়ে আছেন নিজের কোলের উপরে রাখা খবরের কাগজের মলাট দেওয়া একটা বইয়ের পাতায়।

সামনে যেতেই তিনি মুখ তুলে আমার দিকে তাকান। ঝাপসা কাঁচের চশমার আড়ালে তাঁর চোখে যেন এক শান্ত নির্লিপ্ততা। আমার নজরে পড়ে তাঁর সামনে রাখা টিনের তোরঙ্গতে থরে থরে সাজানো কিছু চন্দ্রপুলি একটা স্বচ্ছ পলিথিনের টুকরো দিয়ে ঢাকা।

"চন্দ্রপুলি নেবেন, বাবা? একদম টাটকা, আজই বানিয়েছি"।

"কত করে আপনার মিষ্টি?" জিজ্ঞাসা করি আমি।

"পঞ্চাশ পয়সা পিস, তিনটে নিলে পাঁচসিকে। আপনাকে একটাকাতেই দেব খানে। খুব ভালো খেতে, বাড়িতে বানানো তো"।

ঝলমলে চারপাশের সাথে এত অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিকিকিনির মুখোমুখি হয়ে আমার যেন একটু অস্বস্তিই হয়। খিদে যে একদম পায়নি তা নয়, কিন্তু ভেবেছিলাম যে রাসবিহারী মোড়ে বাস থেকে নেমে বচ্চন সিং-এর দোকান থেকে মটন রোল কিনে খেতে খেতে বাড়ির দিকে হাঁটা দেব। ফুটপাতের তেলেভাজা যে আর কতকাল খেতে পাব না, কে জানে?

মনের এই দোলাচলের মাঝেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বছর পনেরোর একটি ছেলে সেই বৃদ্ধার পাশে নোংরা ফুটপাথের উপরে একটা ছোট্ট মাদুরে কাপড়ের পুঁটলি মাথায় দিয়ে শুয়ে। চেহারাটা শীর্ণ, কিন্তু পা দুটো অস্বাভাবিক রকমের ফোলা। সম্বিত ফেরে সেই বৃদ্ধার

ডাকে। দেখি একটা কাগজের ঠোঙ্গায় তিনি তিনটি চন্দ্রপুলি ভরে এগিয়ে দিয়েছেন আমার দিকে।

“খান, আমার কাছে জলও আছে, দেবো খানে”।

এরপরে আর না বলা যায় না। এক কামড় মুখে দিয়েই বুঝতে পারি যে চন্দ্রপুলির স্বাদ এমন কিছু আহামরি নয়। গা গুলিয়ে ওঠা সেই কড়া মিষ্টি স্বাদের মিইয়ে যাওয়া চন্দ্রপুলি চিবোতে চিবোতে জিজ্ঞাসা করলাম, “আচ্ছা, ওই যে আপনার পাসে শুয়ে আছে ছেলেটি, ও আপনার কেউ হয়?” তিনি উত্তর দিয়েছিলেন স্নেহসিক্ত গলায়।

তারপরে কথায় কথায় কেটে গেছিল বেশ খানিকটা সময়। শুনেছিলাম তাঁর জীবনের ওঠা পড়ার কাহিনী। তিনি ছিলেন উত্তর কলকাতার কোনও বর্ধিষ্ণু পরিবারের সন্তান, প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা উচ্চশিক্ষিতা। কৃষ্ণনগর কলেজের ফিজিক্সের অধ্যাপক স্বামী টিবি রোগে ভুগে মারা যান সত্তরের দশকে। আর বছর দশেক আগে তাঁর একমাত্র ছেলে স্ত্রী সন্তানকে নিয়ে অরুণাচল প্রদেশে বেড়াতে গিয়ে এক জিপ দুর্ঘটনায় সস্ত্রীক শেষ হয়ে যায়। পেটে আঘাত পেয়ে আংশিক ভাবে বিকল হয়ে যাওয়া কিডনি নিয়ে কিশোর নাতিটি সেই থেকে প্রতিপালিত হচ্ছে ঠাকুমার কাছে। মল্লিকবাজারের কাছে এক বস্তির ঘরে থেকে নিজের বিধবা ভাতা আর চন্দ্রপুলি বিক্রির রোজগারে তিনি আগলে রেখেছেন রুগ্ন নাতিকে। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে তাঁর সাথে কথা বলে আমার একবারও মনে হয় নি যে জীবনের প্রতি তিনি বীতশ্রদ্ধ। আমার কৌতূহলে কিছুটা অনিচ্ছাভরে সাড়া দিয়ে, তিনি আমাকে দেখিয়েছিলেন যে তাঁর কোলের উপরে রাখা বইটা বুদ্ধদেব বসুর প্রেমের কবিতার সংকলন, পাড়ার লাইব্রেরি থেকে জোগাড় করা।

সেদিন চন্দ্রপুলির পয়সা মিটিয়ে দিয়ে বাস ধরার জন্যে এগিয়ে গিয়েছিলাম রাস্তার মোড়ের দিকে। সামনে দিয়ে ধুলো উড়িয়ে বেড়িয়ে গেছে বেশ কয়েকটা বাস, আমার ওঠা হয় নি। তারপরে দ্বিধা জড়ানো মনে পা টানতে টানতে ফেরত গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম সেই চন্দ্রপুলির তোরঙ্গর সামনে।

প্যান্টের পকেটের আড়ালে আমার ঘামতে থাকা হাত দুটোকে লুকিয়ে বলেছিলাম, “পরশু আমাদের বাড়িতে সত্যনারায়ণ পুজো, আমাকে আজ মিষ্টি কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে। আপনার এই চন্দ্রপুলি এত ভাল, তাই ভাবছি এখান থেকেই নিয়ে যাই”।

বিস্মিত চোখে তিনি আমার দিকে তাকিয়েছিলেন – কতগুলো নেবেন?

এই ধরুন, একশো টাকার।

হাত উল্টে তিনি বলেছিলেন, “আজ তো আমার কাছে এত চন্দ্রপুলি নেই।“

সে তথ্য আমার অজানা ছিল না। তোরঙ্গর দিকে তাকিয়ে আমি আগেই বিলক্ষণ বুঝেছিলাম যে তাতে তিনশো পিস মিষ্টি নেই।

পকেট হাতড়ে একটা একশো টাকার নোট বার করে তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, “তাতে কি হয়েছে, কাল সন্ধ্যেবেলা আমাকে আবার এখানে আসতে হবে একটা কাজে। তখন না হয় নিয়ে যাবো আপনার থেকে”।

বাঁ হাত দিয়ে নাতির চুলে বিলি কাটতে কাটতে তিনি ঘাড় তুলে কয়েক মুহূর্তের জন্যে তাকিয়েছিলেন আমার চোখে চোখ রেখে। শিথিল হাতের মুঠোয় আলগোছে টাকাটা ধরে তিনি পরক্ষণেই চোখ নামিয়ে নিয়েছিলেন, “আপনি বাবা কাল আর আসবেন না, তাই না?

“না, না – সে কি কথা। কাল এই সময় আমি ঠিক আসবখানে” – বলতে বলতে সঙ্কুচিত আমি পিছন ফিরে দৌড় লাগাই বাস স্ট্যান্ডের দিকে।

আজও আমার কানে লেগে আছে দূর থেকে শোনা তাঁর স্বগতোক্তি – “গোপাল আপনাকে বড় করুন”।

তারপরে কেটে গেছে দু’ দশকেরও বেশি সময়। নানা কাজের চাপে গোপালও বোধ হয় ভুলে গেছেন আমাকে বড় করার কথা। জীবনের নানা ওঠাপড়ায় আমারও আর বড় হওয়া হয়ে ওঠে নি। আজ এই মাঝপথে এসে থমকে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারি, ‘বড়’ হওয়া বড় কঠিন কাজ।

কোভিড- ১৯ (COVID-19) অতিমারীঃ আর টি -পিসিআর (RT-PCR) আবিষ্কার এবং করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধে এর মূল্যায়ন

গোকুল চন্দ্র দাস

করোনাভাইরাস সংক্রমিত রোগ (কোভিড-১৯, COVID-19) আজ সারা বিশ্বে অতিমারী রূপে দেখা দিয়েছে। প্রায় দু বছর আগে চিনের ওয়ুহান শহরে প্রথমে এই ভাইরাসের (SARS-CoV-2) সংক্রমণ ধরা পড়ে। আজ পর্যন্ত সমস্ত পৃথিবীতে প্রায় ৫১ কোটি লোক সংক্রমিত ও ৬২ লাখ লোকের মৃত্যু হয়েছে। শুধু আমেরিকাতেই ৯.৪ কোটি লোক আক্রান্ত হয়েছে এবং ১০ লাখ লোক প্রাণ হারিয়েছে। তিন বছরে রোগ নির্ণয় পদ্ধতি ও টিকা আবিষ্কার সম্ভব হলেও রোগ প্রতিরোধ করা সম্পূর্ণ সম্ভব হয়নি। এর অনেক কারণ আছে। যেমন, সংক্রমিত ব্যক্তিকে সঠিক মত চিহ্নিত করা, সংক্রমণের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার পর্যাপ্ত ব্যবস্থার অভাব, পরীক্ষা করা হয়নি এমন লোকের সংখ্যা বেশি হওয়া, অচেনা নতুন ভেরিয়্যান্ট এর জন্ম এবং আত্মপ্রকাশ ও সঠিক টিকাকরণ। যাদের মৃদু উপসর্গ দেখা দেয় তারা নিভৃতবাস বা হোম আইসলেসনে থেকে বাড়িতেই সুস্থ হয়ে উঠছে। কোভিডের উপসর্গ নেই এমন আক্রান্তের সংখ্যা নেহাত কম নয়। কিন্তু যাদের অতিসংক্রমণ জনিত উপসর্গ দেখা দেয়, এবং পরে নিমুনিয়ায় আক্রান্ত হয় তাদের হাসপাতালে পাঠানো এবং ভেনিটিলেটর দিয়ে চিকিৎসা করানই বর্তমান পদ্ধতি। সঠিক ভাবে রোগ নির্ণয়, সংক্রমণ প্রতিরোধের অন্যতম প্রধান উপায়। তা না হলে সুস্থ লোক হাসপাতাল থেকে সংক্রমণ নিয়ে বাড়ি ফিরবে আর সত্যিকারের সংক্রমিত ব্যক্তি বাড়িতে থেকে আরও সংক্রমণ ছড়াবে।

পিসিআর(PCR) বা পলিমারেজ চেইন রিয়্যাকসান বর্তমান রোগ নির্ণয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। অন্য যে সব পদ্ধতি আছে তা এ্যান্টিবডি (antibody) অথবা এ্যানটিজেনের (antigene) ওপর নির্ভরশীল, সময়সাপেক্ষ এবং কম সঠিক। তাই বর্তমান প্রবন্ধে আমি শুধু পি সি আর (PCR) এর ওপর আলোকপাত করতে চাই- কি ভাবে ওটা আবিষ্কৃত হয়েছিল , রোগ নির্ণয় পদ্ধতি এবং এর সীমাবদ্ধতা। ক্যারি মুলিস পি এইচ ডি, এর আবিষ্কারক। ১৯৮৩ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার সিটাস কর্পোরেশন'এ কাজ করার সময় এই পদ্ধতিটি তিনি আবিষ্কার করেন। তার জন্যে ওঁকে ১৯৯৩ সালে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়। মানব সভ্যতার অশেষ কল্যাণ সাধন করবে এই রকম দৃষ্টান্তমূলক আবিষ্কারকেই সাধারণতঃ নোবেল প্রাইজ প্রাপক হিসেবে গণ্য করা হয়। সৌভাগ্যবশতঃ বিগত ৩০ বছরের অনেক যুগান্তকারী আবিষ্কারের ওপর ভিত্তি করেই এই পি সি আর পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল। এই পদ্ধতিটি সত্যিকারের কি এবং কি ভাবে করা হয় সেটা জানলে সংক্রমণ প্রতিরোধ করা অনেক সহজ হবে।

যাদের প্রাণ আছে যেমন মানুষ, ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া সবারই একটি জেনম (genome) থাকে যাতে তার বংশের ও জীবনের তথ্য সংরক্ষণ করা থাকে যেটা সময়মত প্রকাশ পায়। এই জেনম ডিএনএ (DNA) বা আরএনএ (RNA)। আমাদের দেহে জীবকোষের নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজোম ডিএনএ দিয়ে তৈরি। এর মধ্যে বংশানু বা জিন (gene) লুকিয়ে রয়েছে। করোনাভাইরাস জেনম একটি মেসেন্জার (বার্তাবহক) আরএনএ (mRNA)। এই ধরণের আরএনএ আমাদের দেহে ডিএনএ থেকে সংকেত নিয়ে সাইটোপ্লাজমে যায় এবং সেখানে প্রোটিন তৈরি করে। ফলে করোনাভাইরাসের সুবিধা হল কোনরকমে জীবকোষের

সাইটোপ্লাসমে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তার নিজের বাঁচার সংগ্রাম আরম্ভ করে। মানব দেহের সরঞ্জামকে কাজে লাগিয়ে, নিজের দরকারি প্রোটিন তাড়াতাড়ি তৈরি করে ফেলে।

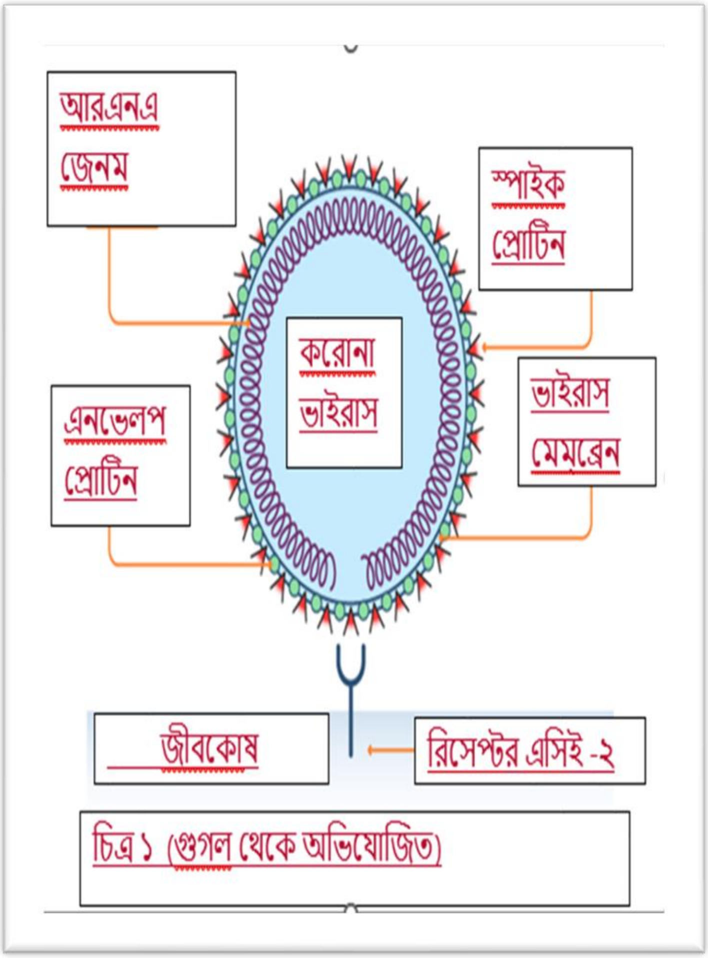

চিত্র ১ (গুগল থেকে অভিযোজিত)

ভাইরাসটি গোলাকার, খালি চোখে দেখা যায় না (চিত্র ১)। এমনকি সাধারণ মাইক্রোস্কোপ'এও ধরা পড়েনা। আমাদের জীবকোষের বাইরের ঝিল্লিতে (membrane) এক ধরণের প্রোটিন থাকে যাকে রিসেপ্টর (receptor) বলে। এটা বকোষের ভিতরে ঢোকার রাস্তা। এই প্রোটিনের একটি অংশ জীবকোষের বাইরে, মাঝের অংশ ঝিল্লির মধ্যে ও শেষ অংশ জীবকোষের ভিতরে থাকে। করোনা ভাইরাসের রিসেপ্টর এসিই ২ (ACE2) নামক একটি প্রোটিন। ভাইরাসের বাইরের দিকে যে স্পাইক প্রোটিন থাকে সেটা এই রিসেপ্টরকে জড়িয়ে ধরে ভিতরে ঢোকার জন্য। প্রথমে শ্বাসনালিতে জীবকোষকে আক্রমণ করে, এবং পরে শ্বাসযন্ত্রে বসতি স্থাপন করে।

জেমস ওয়াটসন এবং ফ্রান্সিস ক্রিক ১৯৫৩ সালে ডিএনএ'র গঠন আবিষ্কার করেন। এটা বিংশ শতাব্দীর এক যুগান্তকারী আবিষ্কার এবং মলিকুলার জীববিজ্ঞানের শুরু। এটা না জানা থাকলে, পিসিআর কোনদিনই আবিষ্কার হত না। ডিএনএ তে দুইটি চেইন থাকে, সুগার এবং ফসফেট মিলে এর মেরুদন্ড (backbone) তৈরি করে এবং এতে পরমানু গুলি বিপরীত ভাবে (anti-parallel) সাজানো থাকে। একটি চেইনে যদি নিচ থেকে ওপরে যায় অন্য চেইনে ওপর থেকে নিচে নামে। সুগারের অবস্থান থেকে একটি চৈইনকে ৫' থেকে ৩' এবং বিপরিত মুখী চৈইন কে ৩' থেকে ৫' দিয়ে চিনি্হত করা হয় (চিত্র ২)। ডিএনএ তে চার রকমের চ্যাপ্টা বেস – অ্যাডেনিন (A), থাইমিন (T), গুয়ানিন (G), সাইটোসিন (C)- সুগার মলিকুল এর সঙ্গে যুক্ত হয় এবং একটি বিশেষ ক্রমে সাজান থাকে। সুগার, বেস ও ফসফেটের সংমিশ্রণই ডিএনএ'র বেসিক ইউনিট- নিউক্লিওটাইড- তৈরি করে। তিনটি বেস একসাথে (যেমন ATG,TGC) এক একটি জেনেটিক কোড যেটা প্রোটিনের ২০টি অ্যামিনো অ্যাসিড (amino acid) এর একটিকে বোঝায়। সব সময়ই একটি চেইন এর A অন্য চেইনের T, এবং G অন্য চেইনের C এর সঙ্গে এক বিশেষ শক্তির (hydrogen bonding) মাধ্যমে যুক্ত থাকে। এই শক্তিই ডিএনএ ডাবল হেলিক্স তৈরী করে এবং চেইন দুটিকে ধরে রাখে। একটি চেইনে যদি ATGC থাকে অন্য চেইনে থাকবে, TACG। এই পরিপূরক বেস পেয়ার তৈরি করাই বংশ ধর্ম সংরক্ষণ করার মূলমন্ত্র। চেইন দুইটি পরস্পরকে জড়িয়ে থাকে এবং সেটা আবার

একটি অক্ষের চারপাশে স্পাইরাল সিড়ির মত (helix) উঠতে থাকে। এক একটা ধাপ যেন এক একটি বেস পেয়ার।

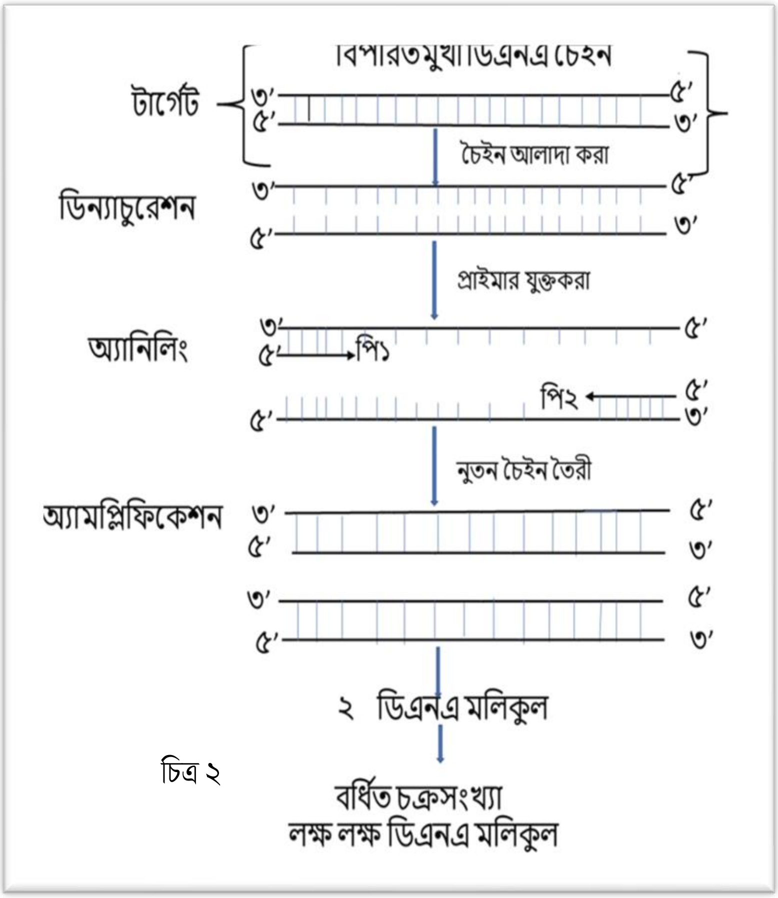

চিত্র ২

অন্য ভাবেও ডিএনএ কে বোঝা যেতে পারে। ডিএনএ’র দুই দিক ধরে টানলে একটি দড়ির মত লম্বা হয়। পাকানো দুইটি সুতা দুইটি সুগার-ফসফেট চেইন, যার থেকে বেস গুলি বেরিয়ে হাইড্রোজেন বন্ডিং দ্বারা আবদ্ধ থাকে (চিত্র ২)। পল ডটি আবিষ্কার করেছিলেন উচ্চ তাপমাত্রায় ডিএনএ হেলিক্ষ এর চেইন দুইটি আলাদা হয়ে যায় ডিন্যাচুরেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। তাপমাত্রা কমাতে থাকলে চেইন দুইটি আবার জোড়া লাগে এবং বেস পেয়ার তৈরি করে । পিসিআর জন্য যে প্রাইমার লাগে সেটা অল্প সংখ্যক নিউক্লিওটাইড দিয়ে তৈরি। বিচ্ছিন্ন চেইনের ৩’ শেষ প্রান্তে এই প্রাইমার যুক্ত হয়। আরথার কর্নবার্গ ১৯৫৬ সালে একটি এনজাইম, ডিএনএ পলিমারেজ্, আবিষ্কার করে ১৯৫৯ সালে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। জীবকোষ বিভাজনের জন্য এই এনজাইম ডিএনএ-র কপি করা অর্থাৎ প্রতিলিপিকরণে (Replication) অপরিহার্য। এটা ডিএনএর নতুন চেইনকে এক প্রান্ত (৫’) থেকে অন্য প্রান্তের (৩’) দিকে সম্প্রসারিত করে। ডিএনএ প্রতিলিপিকরণের সঙ্গে পিসিআর এর অনেক মিল আছে। পিসিআর এর জন্য এটা অত্যাবশ্যক, এটা না হলে পিসিআর আবিষ্কার হত না।

ক্যারি মুলিস এই অগ্রগতি সম্বন্ধে অবগত ছিলেন । সিটাস করপোরেশনে কাজ করার সময় তাঁর কাজ ছিল সকলের জন্য অলিগোনুক্লিওটাইড (oligonucleotide) তৈরি করা। এই সময় ওঁর মনে আসে অলিগোনুক্লিওটাইড দিয়েও মানুষের বংশানুর (জিনের) পরিবর্তন বা মিউটেশন চিনিহ্ত করবে । কিন্তু একক (single copy) জিনের ক্ষেত্রে সিগনাল কম জোর হওয়ায় সেটা সফল হয়নি। অনবরত মাথায় ঘুরতে থাকে কি করে এই সিগনাল বাড়ানো যায়। এক রাতে ক্যালিফোর্নিয়ার পার্বত্য এলাকায় গাড়ি চালানোর সময় এক বুদ্ধি মাথায় আসে যে দুইটি চেইন’এর জন্য বিপরীতমুখী দুইটি আলাদা প্রাইমার ব্যবহার করে এই সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে। এটা সম্ভব। ক্যারি মুলিস ঝাপিয়ে পড়লেন পরীক্ষা করার জন্য। এর জন্য তিনটি ভিন্ন তাপমাত্রা প্রয়োজন। সেটা প্রথমে বিকার’এ জল গরম করে আরম্ভ করেন। ৯৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে (°C) চেইন

দুইটি আলাদা করা, ৫৫°C এ দুইটি চেইনের সঙ্গে প্রাইমার লাগানো এবং সেই প্রাইমার ৭২°C এ অন্যদিকে বাড়িয়ে নতুন চেইন তৈরি করা । এতে এক সমস্যা দেখা দিল। ডিএনএ পলিমারেজ ৯৫°C তাপমাত্রায় উন্মুক্ত হলে নষ্ট হয়ে, আর কাজ করতে পারে না। সেইজন্য প্রতি সাইকেলে এটা যোগ করতে হয়। টমাস ব্রোক এবং হাডসন ফ্রীজ ১৯৬৯ সালে গরম ফোয়ারার জল থেকে এক ধরনের থার্মোফিলিক (thermophilic) ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কার করেছিলেন। এর থেকে যে ডিএনএ পলিমারেজ এ্যালিস চিয়েন ও জন ট্রেলা শুদ্ধ করেছিলেন সেটা উচ্চ তাপমাত্রাতেও বেচে থাকে। হেনরি ইরলিক এর দল ডিএনএ পলিমারেজের বদলে ট্যাক পলিমারেজ পিসিআর বিক্রিয়ায় ব্যবহার করার পর কাজ অনেক সহজ হল। এটাই পিসিআর'এর জন্মের এবং শৈশবের ইতিহাস। সতেরো বছর আগে ভারতীয় নোবেল প্রাইজ প্রাপক হরগোবিন্দ খোরানাও তাত্বিক ভাবে এই সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছিলেন কিন্তু পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেননি।

চিত্র সংখ্যা ২ তে পিসিআর প্রণালীতে ডিএনএ র যে অংশ পিসিআর করা হবে (DNA target) সেটা একটি বন্ধনীর মধ্যে দেখান হল। দুইটি বিপরীতমুখী পলিনিউক্লিওটাইড চেইন এবং এটি / জিসি (AT/GC) বেস পেয়ার লম্বা দাগ দিয়ে দেখান হয়েছে। অতি তাপমাত্রায় (৯৫°C অথবা

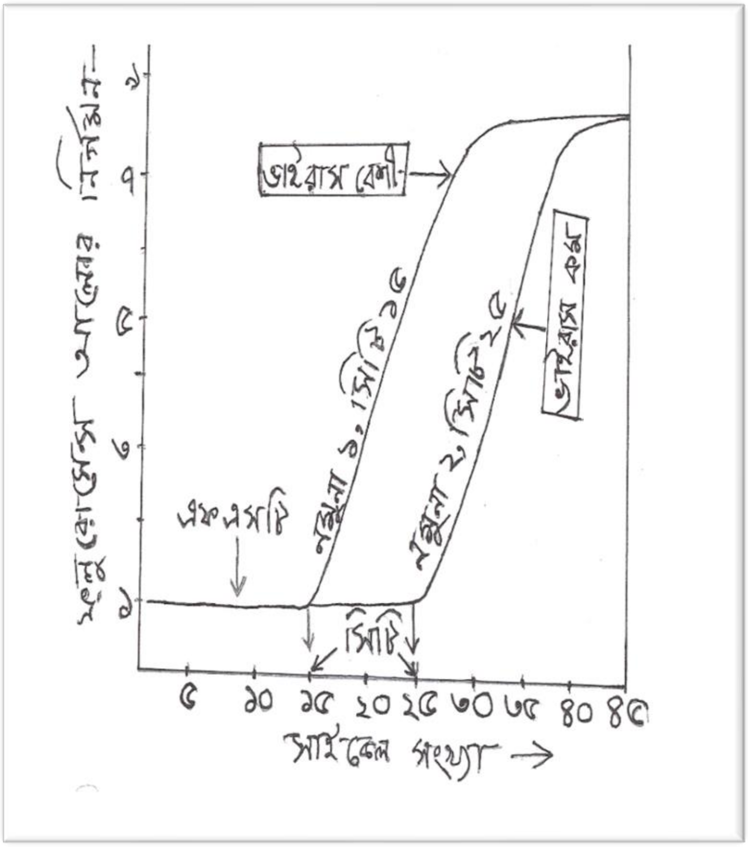

তার ওপরে) ডিএনএ চেইন আলাদা হয়েছে। তাপমাত্রা কমতে থাকলে ৫৫° C এ প্রাইমার দুটি চেইনের ৩' প্রান্তে স্টিক করে। এই বিক্রিয়ায় ডিএনএ পলিমারেজ এবং চার রকমের বেস রয়েছে। ফলে ডিএনএ পলিমারেজ ৭২°C এ প্রাইমার কে নতুন চেইনের এক প্রান্ত (৫') থেকে অন্য প্রান্তের (৩') দিকে বাড়াতে থাকে। প্রায় দুই মিনিটেই এই কাজ সম্পন্ন হয় এবং একটি থেকে দুইটি ডিএনএ তৈরি হয়।

প্রতি চক্রে ডিএনএ এর পরিমান দ্বিগুণ হতে থাকে। ২,৪,৮,১৬… এই রকম ভাবে বাড়তে বাড়তে এক ঘন্টার মধ্যে কোটি কোটি ডিএনএ তৈরি হয়। এটা ফটোকপি মেশিনের মত কাজ করে। পিসিআর এর জন্য তিনটি শীততাপ চক্র দরকার। তাছাড়া সেন্সিটিভিটি (sensitivity) এবং স্পেসিফিসিটি (specificity) খুব বেশি হওয়ায় পরীক্ষা খুবই সূক্ষ। প্রথমটি নির্ধারণ করে কত কম সংখ্যক ভাইরাসকে ধরা যাবে এবং দ্বিতীয়টি ঠিক করে প্রাইমার শুধু করোনাভাইরাস জেনমকেই ধরবে।

করোনাভাইরাস জেনম ডিএনএ নয়, আরএনএ। ফলে পিসিআর করতে হলে আরএনএ কেডিএনএ (cDNA)তে পরিবর্তিত করতে হবে। এই কাজটি রিভারস্ ট্রানসক্রিপটেস নামক একটি এনজাইম সম্পন্ন করে। ডেভিড বালটিমর এবং হাওয়ারড টেমিন এই আবিষ্কার

করে ১৯৮০ সালে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। একবার দিস ডিএনএ (cDNA) তৈরি হলে বাকি প্রণালী ডিএনএ আর মত কাজ করে। এই প্রণালীকেই আর টি -পিসিআর (RT-PCR) বলা হয়।

পিসিআর বা আরটি-পিসিআর শুধু মাত্র বলতে পারে সংক্রমণ আছে কি নেই। তার বেশি জানা যায় না। সংক্রমণ কোন স্তরে আছে এবং কতটা মারাত্মক হতে পারে তা জানতে হলে পরীক্ষা পদ্ধতি উন্নত করা দরকার। আবার একটি অলিগোনুক্লিওটিড প্রোব (probe) বানানো হয় যেটা দুইটি চেইনেরই প্রাইমারের নিচের দিকে বাঁধে। তার মাথার দিকে থাকে একটি ফ্লুরোসেন্ট (fluorescent) মলিকুল এবং শেষের দিকে থাকে কোয়েনচার (quencher) যার কাজ হল প্রোবটি চেইনে লেগে থাকা অবস্থায় ফ্লুরোসেন্স আলোর নির্গমন ঘটতে না দেওয়া। প্রোবটি ভেঙ্গে দিলে তবেই, আলোর নির্গমন দেখা যাবে। এবং সেই আলো মাপা যাবে। ট্যাক পলিমারেজের একটি বিশেষ গুণ হল ডিএনএ চেইন পরিবর্দ্ধিত করার সময় এই প্রোবকে ভেঙ্গে গুঁড়ো করে দেয় আলোর নির্গমন ঘটাতে। চক্রের সংখ্যা যত বাড়তে থাকে আলোর পরিমাণ তত বাড়ে । আবার চক্রের সংখ্যা এবং আলোর পরিমাণ এর গ্রাফ্ থেকে দুইটি তথ্য পাওয়া যায় (চিত্র সংখ্যা ৩)। ফ্লুরোসেন্স সিগন্যাল থ্রেসলড (Fluorescence Signal Threshold) বা এফএসটি (FST) আলোর বেস লাইন ঠিক করে এবং সাইকেল থ্রেসলড (Cycle Threshold) বা সিটি (CT), যেটা দেখায় কোন সাইকেলে আলোর সিগনাল ধরা পড়ছে। এটাই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। এই পদ্ধতিকে আর টি-কিউ পিসিআর (RT-qPCR) বলে। ভাইরাসের সংখ্যা যত বাড়বে, সিটি তত কমতে থাকবে। অর্থাৎ কম সাইকেলেই এই আলো দেখা যাবে। সিটি<৪০, ভাইরাস পসিটিভ (positive) সিটি>৪০, ভাইরাস নেগেটিভ (negative), সিটি ৩৭-৪০, অল্প ভাইরাস থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। এটা কন্টামিনেসনও (contamination) হতে পারে। সুতরাং পরীক্ষা পুনরায় করা দরকার। এই ব্যাপারে নিশ্চিত হওয় শক্ত ব্যাপার, কিন্তু সংক্রমণ ছড়ানোর জন্য এটাই সব থেকে সহজ উপায়।

দুইটি পদ্ধতিতে পিসিআর এবং আরটি বিক্রিয়া এক টিউবে অথবা দুইটি আলাদা টিউবে করা হয় । তার জন্য ফল আলাদা হতে পারে। তাছাড়া ভাইরাসের পরিমাণ সঠিক ভাবে পরিমাপের জন্য একটি আভ্যন্তরীন কন্ট্রোল (internal control) ব্যবহার করা দরকার। সংক্রমণের পর কখন পরীক্ষা করা হচ্ছে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। একটা সময় আছে যখন ভাইরাসের সংখ্যা কম থাকার জন্য পরীক্ষায় ধরা পড়েনা। ইনকুবেশন পিরিয়ডে উপসর্গ দেখা যাওয়ার দুই দিন আগে, রোগী ভাইরাস ছড়াতে পারে যা অন্য লোকের শরীরে প্রবেশ করে। পিসিআর'এর বড় সমস্যা হল ফলস পজিটিভ (false positive, মিথ্যা হ্যাঁ) এবং ফলস নেগেটিভ (false negative, মিথ্যা না) ফল। এর জন্যই তাড়াতাড়ি সংক্রমণ ছড়ায়। এটা কমানোর জন্য দুইটি কন্ট্রোল ব্যবহার করা হয়। পসিটিভ কন্ট্রোল ফলস নেগেটিভকে এবং নেগেটিভ কন্ট্রোল ফলস পসিটিভকে বন্ধ করে বা এদের সংখ্যা কমিয়ে দেয়। ভাইরাসের সংখ্যা কম থাকলে মিথ্যে না এর সংখ্যা বেশি হয় (১০-৩০) শতাংশ, এবং রোগী নিশ্চিন্তে বাড়ীতে থাকে সকলের সঙ্গে। অনেক মিথ্যে হ্যাঁ ও এই পরীক্ষায় দেখা যায় এবং রোগীকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখান থেকে একটি সুস্থ লোক সংক্রমণ নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারে। তার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত হারে কম। আরটি-পিসিআর টেস্ট এ অনেক সমস্যা দেখা দেয়, অনেক কারণে। যেমন, আরএনএ অপরিষ্কার থাকলে অথবা সেটা ঠিক তাপমাত্রায় স্টোর না করলে আর এন এ ভেঙ্গে যেতে পারে। আরএনএ ভাঙ্গা কিনা সেটা আর একটি আভ্যন্তরীন কন্ট্রোল (internal control) নিয়ে বোঝা যায়। সমস্ত পরীক্ষা এক জন ট্রেনিং প্রাপ্ত লোক দিয়ে করানো দরকার। ভুল কেমিকাল ব্যবহার করা, পসিটিভ বা নেগেটিভ

কন্ট্রোল ব্যবহার না করা এবং আরএনএ'র মান নির্ণয়ের জন্য আভ্যন্তরীন কন্ট্রোল ব্যবহার না করলে আর টি পিসিআর দ্বারা সংক্রমণ নির্ণয়ে অনেক ভুল থেকে যায়।

ভাইরাস শরীরের বাইরে প্রাণহীন। শরীরে প্রবেশ করার পর দেহের কলকব্জা গুলি হাইজ্যাক (hijack) করে নিজের বংশ বৃদ্ধি করার কাজে ব্যবহার করে। যত বেশিদিন শরীরের মধ্যে থাকে তত বেশি এর জিনের মিউটেশন হয়। আর নতুন নতুন ভেরিয়্যান্ট তৈরি হয়। এদের ক্ষমতা অনেক ভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। নতুন প্রজন্ম অনেক বেশি সংক্রমণ ছড়াতে পারে, আরও কঠিন রোগের সৃষ্টি করতে পারে, নতুন ভ্যাক্সিনকে কার্যকারী নাও করতে পারে, অথবা, প্রাইমার দিয়ে আরটি-পিসিআর পরীক্ষায় ভাইরাস ধরা নাও পরতে পারে। ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত একটি ডেলটা ভেরিয়্যান্ট প্রাথমিক করোনাভাইরাস থেকে দ্বিগুণ শক্তিশালি। স্পাইক প্রোটিন'এ ১০টি মিউটেশন (mutation) রয়েছে। তার মধ্যে দুইটি রিসিপ্টর বায়িন্ডিং ডোমেনে (Receptor Binding Domain) বা আরবিডি (RBD) তে, যেটা ঝিল্লির বাইরের দিকে থাকে এবং ভাইরাস্ কে ভিতরে ঢুকতে সাহায্য করে। আবার নতুন ওমিক্রন ভেরিয়্যান্টের গোটা জেনমে ৫০টি মিউটেশন রয়েছে । তার ৩৬টি আছে স্পাইক প্রোটিনে এবং ১৫টিই আরবিডি'তে। এই ভেরিয়্যান্ট অনেক তাড়াতাড়ি সংক্রমণ ছড়ায়। এর থেকে সহজেই অনুমান করা য়ায় স্পাইক প্রোটিনের আরবিডি অংশ জীবকোষে ঢোকার জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। এই অংশে মিউটেশনের ফলে ভবিষ্যতে আরও অনেক ভেরিয়্যান্ট তৈরী হতে পারে। যেটা খুবই বিপজ্জনক । বর্তমানে ওমিক্রনের আরও কয়েকটি ভ্যারিয়ান্ট (BA.2, BA.3, BA.4, BA.5) অনেক দেশে ধরা পড়েছে কিন্তু ওর উপর বেশি তথ্য এখনও জানা নেই। BA.5 সব থেকে বেশি সংক্রামক। এতে স্পাইক প্রোটিন জিনে বেস মিউটেশন ছাড়াও একটি ছোট ডিলিসন (deletion) আছে যার ফলে প্রোটিনটিতে দুইটি অ্যামিনো অ্যাসিড কম আছে । ভাইরাস জেনমের এই ধরনের পরিবর্তন প্রাইমার যুক্ত হতে বাধার সৃষ্টি করতে পারে। BA.4 এবং BA.5 একসঙ্গে আমেরিকায় সংক্রমণের প্রায় ৮০% ক্ষেত্রে বর্তমান।

কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণে আরটি-পিসিআর এর অবদান অসামান্য । লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ বাঁচিয়েছে এই পরীক্ষা পদ্ধতি। দূর্ভাগ্যবশতঃ ক্যারি মুলিস মাত্র কয়েক মাসের জন্য সেটা দেখে যেতে পারেননি । কিন্তু এটাকে অধিক কার্যকারী করতে পরীক্ষা আরও সঠিকভাবে করা প্রয়োজন। সমস্ত পরীক্ষা অভিজ্ঞ লোক দিয়ে করা দরকার। পূর্বে আলোচিত তিনটি কন্টোলসহ আরটি-কিউপিসিআর এমন ভাবে সেট আপ করতে হবে যেন এটা খুব কম সংখ্যক ভাইরাসকেও ধরে ফেলতে পারে। এই পরীক্ষা

খুবই সূক্ষ যেহেতু প্রতিটি সাইকেল (cycle) লিপিবদ্ধ হয় এবং এতে শুধু করোনাভাইরাসই (specificity) ধরা পরে। এর জন্য কয়েক ঘন্টা থেকে তিন চার দিনও লাগতে পারে। মেডিকেল এবং ট্রাভেল এর জন্য যে দ্রুত আরটি-পিসিআর পরীক্ষা করা হয় সেটা দ্রুত (৩-৪ ঘন্টা) পরীক্ষার ফল প্রকাশ এবং পরীক্ষা নির্ভুল হওয়ার মধ্যে এক সামঞ্জস্য রক্ষা করা। অনেক ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও জরুরি পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য এটা মেনে নেওয়া হয়। তবে একই পরীক্ষায় পসিটিভ ও নেগেটিভ কন্ট্রোল ব্যবহার করলে ফলস নেগেটিভ ও ফলস পসিটিভের সংখ্যা কম হবে এবং ভাইরাস সংক্রমণ রোধ করতে সাহায্য করবে। সংক্রমণ রোধ করার চাবি কাঠি অনেকটাই এখনও লুকিয়ে রয়েছে কখন নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ও কিভাবে করা হয়েছে এবং আরএনএ-র সংরক্ষণ ও মানের ওপর। আরএনএ তৈরীর সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার না করলে এটাকে সঠিক ভাবে সংরক্ষণ করা খুবই জরুরি। নতুন ভ্যারিয়ান্ট আরও কঠিন রোগের উৎপত্তি করবে কিনা সেটা সিটি ভ্যালু থেকে নাও বোঝা যেতে পারে। কারণ এটা শরীরে আরও অন্য কোন কঠিন রোগ আছে কিনা তার ওপরও নির্ভরশীল। আরটি-পিসিআর পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ক্লিনিক্যাল উপসর্গও পর্যবেক্ষণ করা বিশেষ জরুরী।

বিশদ বর্ণনা ও ইংরেজী ভাষার জন্য নিচের লিঙ্কটি ব্যবহার করুনঃ

https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/author/gokul-c-das/

(এই প্রবন্ধটি আমার পিএইচডি মেন্টর, স্বর্গত ডঃ নীরজ নাথ দাশগুপ্ত, পিএইচডি (লন্ডন) এফএনএ, পালিত প্রোফেসর এবং পদার্থবিদ্যা বিভাগীয় প্রধান ,কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কে উৎসর্গ করিলাম যিনি আমাকে বাংলা ভাষায় সাধারণের জন্য বিজ্ঞান বিষয়ক লেখায় অনুপ্রাণিত করেছিলেন।)

হিউস্টনে সত্যজিৎ রায়ের দিনগুলি

গোকুল চন্দ্র দাস

শান্তিনিকেতনের আর্ট স্কুলে পড়াশুনা করেছেন এবং মাত্র ছয় বছর বয়েসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত থেকে তার সম্বন্ধে লেখা কবিতা উপহার পেয়েছেন। সুতরাং ছায়াপথের মাঝখানে সত্যজিৎ রায় ছিলেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, যার কোনদিনই পতন হবে না। তাঁর সৃষ্টি নিজ গুণেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মেও জ্বলজ্বল করবে এবং পথ দেখাবে। কিংবদন্তি চিত্র পরিচালক, শিল্পী ও লেখক সত্যজিৎ রায়ের জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হল । এই মহান নাগরিককে আমার সশ্রদ্ধ প্রনাম জানাই। তাঁর অনবদ্য সৃষ্টির মাধ্যমে যে উপহার তিনি আমাদের দিয়েছেন, তা চির অমর হয়ে থাকবে। পথের পাঁচালির অপু এবং দুর্গা, ইন্দির ঠাকরুণ ও সর্বজয়াও চিরদিন বেচে থাকবে এবং তার সাথে অক্ষয় হয়ে থাকবে চরম দারিদ্র্যের মধ্যেও একটি গ্রাম্য পরিবারে হরিহরের ধিকি ধিকি করে সম্মানের সঙ্গে বেচে থাকার এক জীবন্ত চিত্র। এত অভাবের মধ্যেও কিন্তু শিশুমনের আনন্দ উচ্ছাস হারিয়ে যায়নি। তার বহিঃপ্রকাশ- কাশ বনের মধ্যে দিয়ে অপু ও দুর্গার প্রথম রেলগাড়ি দেখার আনন্দ, পুকুরঘাটে ভাইবোনের বৃষ্টিতে ভেজার মজা, ইন্দির ঠাকরুণকে বাগানের ফল চুরি করে খাওয়ানো---এই ছবিগুলি এতই জীবন্ত যে এই প্রথম একটি ভারতীয় ফিল্ম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করে। প্রতিষ্ঠিত হলেন সত্যজিৎ রায়। সেই শুরু।

তারপর অল্প কথায়, "চারুলতা"য় চারুর একাকিত্ব এবং দাম্পত্য সঙ্কট, 'মহানগর'এ আরতির গোঁড়া নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে নারী স্বধীনতার জন্য লড়াই, 'নায়ক'এ অর্থনৈতিক সাফল্য ও জনপ্রিয়তার মধ্যেও অরিন্দমের মানসিক নিরাপত্তার অভাব এবং একাকিত্বর মত বহু সামাজিক সমস্যাকে বিভিন্ন ফিল্মে নিখুত ভাবে উদ্ঘাটন করেছেন। তুলে ধরেছেন ক্রমবর্ধমান এবং সময়োপযোগী সমস্যা, যেমন গণশত্রুতে ডাক্তার দাদা ও রাজনীতিবিদ ভাই এর পারিবারিক মুল্যবোধের তফাৎ এবং দ্বন্দ্ব ।১৯৭০ এর দশকে কলকাতা যখন আইন শৃঙ্খলার অবনতি, বেকারত্ব ও দুর্নীতি নিয়ে জর্জরিত, কলকাতা ত্রয়ি সিরিজের তিনটি ফিল্মে সেটা নিখুঁত ভাবে তুলে ধরেছেন। মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন শিক্ষিত যুবক অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাবে এবং সামাজিক দুর্নীতি ও বেকারত্বের জ্বালায় বিভ্রান্ত হয়ে, কিভাবে নিজেকে পরিবর্তনশিল সমাজের সঙ্গে এক সারিতে খাপ খাইয়ে নিতে না পারায় মানসিক যন্ত্রণার ও দ্বন্দ্বের শিকার হয়েছিল তা 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ও 'জন অরণ্য'তে নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। রয়েছে কলকাতার আধুনিকীকরণের মধ্যে কি ভাবে সমসাময়িক কর্পোরেট কালচার ও লোভ বাসা বাঁধছে তার বর্ণনা (সীমাবদ্ধ)। 'ঘরে বাইরে'র সন্দীপ আমাদের খুব চেনা। স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে সন্দীপের প্রভাবে ঘরের বউ বিমলা কি ভাবে অল্প সময়ে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী নিখিলেশের প্রেম ও স্বদেশী আন্দোলনে নিজের মতামত প্রকাশ করেছিল তা রবীন্দ্রনাথের মনেরই প্রতিফলন এবং এক অপূর্ব প্রতিস্থাপনা। ফিল্মের মাধ্যমে সত্যজিৎ রায় সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করেছে্ন। ফিল্মের বহু ঘটনাতেই আপনার জীবনের অনেক মিল খুজে পাবেন। অসাধারণ এবং বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সত্যজিৎ রায় জীবনে বহু সম্মানে বিভূষিত হয়েছেন। জাতীয় স্তরের অসংখ্য ফিল্ম এ্যাওয়ার্ড বাদ দিয়ে যেগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য তার মধ্যে পড়ে ভারতরত্ন (১৯৯২), অস্কার ফর লাইফ টাইম এ্যাচিভমেন্ট (১৯৯২) ফরাসি প্রেসিডেন্টের লেজিওন অফ হনর (১৯৮৭)। ১৯৭৬ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি সাম্মানিক ডি লিট ডিগ্রি প্রদানের সময় সত্যজিৎ রায়ের অনবদ্য সৃষ্টির বর্ণনা দিয়েছেন মাত্র একটি বাক্য ব্যয় করে। সেটা এই রকমঃ What he (সত্যজিৎ) shows really what happens and what he says, it demands to be said. এই অতি সত্য কথাটা আমার এখনও মনে

আছে এই জন্য যে আমি তখন প্যারিসে । সপ্তাহান্তে নিঃসঙ্গ জীবনে দুস্প্রাপ্য ইংরেজি খবরের কাগজগুলো আগাগোড়া বারবার পড়তাম দেশের কোন খবর আছে কিনা এই জন্য। খুবই গর্ব অনুভব করেছিলাম।

টুকরো টুকরো ঘটনা দিয়ে একটা গোটা জীবনের মালা গাঁথা যায়। সত্যজিৎ সহধর্মিণী শ্রীমতী বিজয়া রায়ের সাম্প্রতিক লেখা থেকে (Manik and I: My life with Satyajit Ray) জানা যায় যে সত্যজিৎ রায়, তাঁর জীবনের কয়েক সপ্তাহ হিউস্টনে কাটিয়েছেন। উনি সপরিবার এখানে এসেছিলেন হার্টের সার্জারির জন্য। টেক্সাস মেডিকেল (Texas Medical Center) সেন্টারের হার্ট ইনসটিউটে (Texas Heart Institute, ১৮ জুন, ১৯৮৪ সালে তাঁর সার্জারি করেন স্বনামধন্য পৃথিবী বিখ্যাত সার্জেন ডঃ ডেন্টন কুলি (Denton Cooley)।

মেডিকেল সেন্টারের কাছাকাছি হলিডে ইন'এ প্রায় দুই সপ্তাহের বেশি সময় ছিলেন । এই সময় অনেকেই বিশেষ করে ডঃ ভি এস মাথুর (V.S.Mathur) ডঃ কুলির টিমে ছিলেন ও অনেক সাহায্য করেছেন। ২৮শে জুন উনি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান। সার্জারির দিন হাসপাতালে ১৫০ জনের মত লোক হাজির হয়েছিল। বিজয়া রায়ের ভাষায়, "There were a lot of other people waiting in the hall - these were boys and girls, elderly men and women - altogether there must have been at least 150 people."

এই সময় আরও একটি বাঙ্গালী ফ্যামিলি বিশেষভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিলেন। তাঁরা হলেন শ্রীমতি সুনন্দা ও শ্রী অশোক নাথ। অমৃতবাজার পত্রিকার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকান্তি সরকারের মেয়ে এবং জামাই। ওঁরা সত্যজিৎ ও বিজয়া রায়কে ওঁদের বাড়িতে নিয়ে গেছিলেন । বিজয়া রায়ের লেখা থেকে -- "We became well-acquainted with the Bengali families settled in Houston, particularly with Sunanda and Ashok, daughter, and son-in-law of Amrita bazar Patrika's Prafulla Kanti Sarkar. They took me to their beautiful house, which had a swimming pool and a lovely garden. Behind their house was a wonderfully dense forest (which you can see still today in the picture below) …Soon after Manik returned to the hotel, they invited us over a meal, while Ashok looked after Manik, Sunanda showed me around the city of Houston. তবে ওখানে রাত কাটিয়ে ছিলেন কিনা সেটা পরিষ্কার নয়।

আমি দীর্ঘদিন হিউষ্টনে বসবাস করছি। বেইলোর কলেজ অফ মেডিসিন (Baylor College of Medicine) এ কাজ করার জন্য টেক্সাস হার্ট ইন্সিটিউটএর সামনে দিয়ে আমার নিত্য আসা যাওয়া। সেই সুবাদে কলকাতা থেকে আমার সহপাঠী ও পরম বন্ধু ডঃ সুব্রত রায় এবং তার সুযোগ্যা কন্যা শ্রীমতি সুমিত্রা রায় আমাকে অনুরোধ করেছিলেন ডঃ মাথুর এবং সুনন্দা ও অশোক নাথের সঙ্গে যোগাযোগ করতে এবং আমাদের অজানা। নতুন কিছু তথ্য জানা যায় কিনা, তা দেখতে।

যদিও আমি অনেক চেষ্টা করেও এ ব্যাপারে সফল হইনি, তথাপি কোথায় সত্যজিৎ রায়ের সার্জারি হয়েছিল এবং কোথায় তিনি পায়ের ছাপ রেখে গেছেন সেই কথাটি বলার জন্য এই প্রতিবেদনের অবতারণা। আমি নাথ ফ্যামিলির সঙ্গে অনেক ভাবে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি । ওদের বাড়ির (নিচের ফটো) দুটি গেট সব সময়ই বন্ধ। বাড়িটি সত্যি একটি বনের মধ্যে। কোনোরকমে গাছের মধ্যে দিয়ে বিলডিংটি দেখা যায়।

বিজয়া রায়ের কথায়,” the house is in a deep forest with swimming pool at the back”.

রেজিষ্টারড মেইল এর প্রাপ্তি স্বীকার কার্ড, স্বাক্ষর ছাড়াই ফেরত এসেছে। আরও জানা গেল, ড্ঃ মাথুরের বয়স এখন ৮৬ বছর। বাধর্ক্য্ জনিত কারণে, তিনিও হয়ত খুব ভাল নেই।

গেটের সামনে দাড়িয়ে এক বিশেষ অনুভুতি মনটাকে ঘিরে ফেলল। সত্যজিৎ রায়ের গলায় রবি ঠাকুরের গানের লাইন গুলিই বারবার মনে হয়েছিল,

“যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে……

আমি বাইবো না মোর খেয়াতরী এই ঘাটে,

…… তখন নাই বা মনে রাখলে

তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাইবা আমায় ডাকলে …”।

জন্মসুত্রে সত্যজিৎ রায় অশেষ সৌভাগ্যের অধিকারী ছিলেন। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরি ছিলেন ঠাকুরদাদা এবং কাদম্বিনী গাঙ্গুলির সৎ মেয়েকে পেয়েছিলেন ঠাকুরমা হিসেবে। উপেন্দ্রকিশোর ছিলেন আবার সমাজ সংস্কারক দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর জামাই।

বাবা সুকুমার রায়, মা সুপ্রভা দেবী। বাবা ও ঠাকুরদাদা উভয়েই ছিলেন বিখ্যাত লেখক, ও চিত্রকর । সত্যজিৎ শিশু বয়সেই পিতৃহীন হন। মায়ের স্নেহ সান্নিধ্যে, সৃজনশীল পরিবেশে সত্যজিৎ বড় হয়েছেন।

শান্তিনেতনের আর্ট স্কুলে পড়াশুনা করেছেন এবং মাত্র ছয় বছর বয়েসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত থেকে তার সম্বন্ধে লেখা কবিতা উপহার পেয়েছেন। সুতরাং ছায়াপথের মাঝখানে সত্যজিৎ রায় ছিলেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, তার কোনদিনই পতন হবে না। তাঁর সৃষ্টি নিজ গুণেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মেও জ্বলজ্বল করবে এবং পথ দেখাবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
গৌরীশঙ্কর মুখার্জ্জী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতে প্রথম ,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের নবজাগরণের
এক নিদর্শন ।
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও সৃষ্টির স্থপতি,
সময়ের সাথে সকলকে নিয়ে পেয়েছে তার জীবন গতি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান, কলা, অর্থ সমাজনীতি,
সাহিত্য - সবই হয়েছে লালিত ,
বিশ্ববিদ্যালয়ের আলো প্রাণস্পন্দনে
সবই হয়েছে চালিত,
শিক্ষকদের গুণে, জ্ঞানে গতি প্রকৃতি হয়েছে সমৃদ্ধ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে সকলের
ভালোবাসায়,
গৌরবান্বিত হয়েছে নানা গুণী শিক্ষকদের শিক্ষকতায়।
বিশ্ববিদ্যালয় শিখিয়েছে সত্যে থেকে দুর্গম পথেও
চলতে সোজা,
শিখিয়েছে জীবনে থেকে জীবন পথে চলার
প্রয়োজনীয়তা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মুক্ত মনে দেখিয়েছে উদারতা,
রমন কৃষ্ণন থেকে রাধাকৃষ্ণন করলেন শিক্ষকতা।
শিক্ষকতাও করেছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সাহিত্য আলোচনায় মন হত আনন্দে ভরপুর।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সৃষ্টি হয়েছে কত শত মাথা মন,
এমনই সব উজ্জ্বল রত্নের আছে অনেক উদাহরণ।

বন্দেমাতরম্ স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ,
জাতীয়তাবাদের গুঞ্জনে এসেছিল এক নতুন অধ্যায়।

দুনিয়া কাঁপানো স্পন্দন বিবেকানন্দ ;
দিয়েছেন হতাশ হৃদয়ে প্রেরণার ছন্দ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক
আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র
নতুন নতুন সৃষ্টিতেই ছিল তাঁর আনন্দ।
আচার্য্য বোস বদলে দিলেন আমাদের চিন্তার ধরণ
তিনিই দেখিয়েছিলেন গাছেরও আছে প্রাণ স্পন্দন।
রসায়নবিদ শিক্ষক ছিলেন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র
গবেষণা, শিল্পের মেলবন্ধননে এনেছিলেন দেশ গড়ার
নতুন ছন্দ।

সত্যের পথে থেকে সত্যেন বোস হদিশ দিলেন
বোসোন কণা
তারই দৌলতে বিশ্বময় বিজ্ঞানীরা করছেন সূক্ষ্ম গবেষণা।

আর এক নক্ষত্র তারা "সাহা আয়নাইজেশন
ইকুএশানের" স্রষ্টা মেঘনাথ সাহা,
কালো মেঘের সাথে যুদ্ধ করে তিনি দেখিয়েছেন
তারার আলোর প্রভা।
তারা কতো উত্তপ্ত, সাহা সমীকরণে জানা যায় তা
এভাবেই আরও উজ্জ্বল হোল এস্ট্রো ফিজিক্স/এর পাতা

পরিসংখ্যান তত্ত্বের দিকপাল প্রশান্ত মহলানবিশ ,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছিলেন এক শিক্ষানবিশ।
পরিসংখ্যান তত্ত্বে দিয়েছেন তিনি পরিমাপের
নতুন পরিভাষা - "মহলানবিশ দুরত্ব"
বাড়িয়েছেন স্টাটিস্টিকাল সাইন্সের গুরুত্ত আরও সমৃদ্ধ।
এই কাজের গুরুত্বে এতোই ছিল আবেদন ,
যার থেকে সৃষ্টি হল সফ্টওয়ার প্রোগ্রাম পাইথন।

সাহা সত্যেনের পরও থামেনি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের
জয়গান।
কলকাতারই অমলবাবু দেখান আইনষ্টাইনের
লিমিটেশন,
অমলদাই সৃষ্টি করেন "রায়চৌধুরীর ইকুএশান",

নতুন করে বোঝালেন তিনি রিলেটিভিটি, সিঙ্গুলারিটির
শক্ত তত্ত্ব,
অমলবাবুর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যালোকে তত্ত্ব হোল
আরও স্পষ্ট।
সেই সমীকরনের জোরে পেনরোজেরা নোবেল জয়ী
হয়ে হলেন মহান ,
ষ্টিফেন হওকিং’ এবং আরও অনেকে হলেন বলবান।
শুনেছি নাম – নোবেলজয়ী পেনরোজ থেকে বিশ্বখ্যাত
ষ্টিফেন হওকিং;
সাহা, সত্যেন, আচার্য্য বসুর মত অমলবাবু থেকে
গেলেন নোবেলবিহীন !

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানীরা করেছেন আনাগোনা,
দেশ বিদেশের মেল বন্ধনে হয়েছে গবেষণা।
শিক্ষান্তে দেশবিদেশে করেছেন বিচরণ,
মানব কল্যাণে করেছেন বিজ্ঞান সাধন।

আনন্দ চক্রবর্তী সাইন্স কলেজেই লেখাপড়া করে
হয়েছেন উন্নত,
আবিষ্কার করেছিলেন তিনি ব্যাকটেরিয়ার নতুন প্রজন্ম ,
তাতেই সমুদ্রের পরিবেশ হল আরও পরিচ্ছন্ন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষ্টিতে
সৃষ্টি হয়েছে বহু ছাত্রের উন্নত মন,
জীবনানন্দ, পল্লী কবি জসিমুদ্দিন থেকে
বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমন,
এমনই সব উন্নত মনের মানুষের আছে অনেক
উদাহরণ।।

নানা পেশার সফল ছাত্রের দৃষ্টান্ত আছে ভূরি ভূরি,
চিরনতুন ছবি আঁকলেন যামিনী রায় থেকে
যোগেন চৌধুরী।
চলচ্চিত্রে অস্কার জয়ী চির নবীন সত্যজিৎ থেকে
নোবেল জয়ী অভিজিৎ।

ছাত্র ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রমেন
চট্টোপাধ্যায়,
সাংবাদিকতার জন্ম দিয়ে তিনি গড়লেন নতুন অধ্যায়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে সকলের প্রাণবন্ত জীবন,
এখানেই পাঠ নিয়েছিলেন বিমল জালান থেকে
বাবু জগজীবন।

অগুন্তি ছাত্র ছাত্রী শিক্ষান্তে নানা পেশায় করেছে প্রবেশ,
এখান থেকেই মনন গড়েছিলেন
স্বামী অগ্নিবেশ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছড়িয়েছে সভ্যতার আলো,
কত শত কাজে ছাত্ররা করেছেন দেশের ভালো।
কৃষ্ণ নামে বিশ্ব মাতিয়েছেন আমাদেরই শ্রীপাদ প্রভু,
শিখিয়েছেন কৃষ্ণ প্রেমে কোন মানুষ নয় উঁচু নিচু।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র ছাত্রীরা দেশে এনেছেন
নানা সম্মান,
প্রার্থনা করি ভালো কাজ করে বিশ্ববিদ্যালয় হোক
আরও মহান॥

কিছু..
যশোমান ব্যানার্জী

কিছু শব্দ মনের মতন
কিছু শব্দ ছলাৎ ছল
কিছু শব্দ মানিক রতন
কিছু শব্দ উৎশৃঙ্খল।

কিছু শব্দ রেল লাইন
কিছু শব্দ রাত্রিবেলা
কিছু শব্দ অলীক আইন
কিছু শব্দ হরবোলা।

কিছু মনের গল্প কথা
কিছু সাজান বাগান রাখি
কিছু মিথ্যে নকশিকাঁথা
শুধু ভুল রঙে মুখ মাখি।

ভুলে যাওয়া
যশোমান ব্যানার্জী

গোধূলি আলোয় ধুয়ে যায় রাত
চলে যাওয়ার বাতাসে তুমি থাকো
বিশালতা ঢাকে ডাল ভাত
ভুলে যাওয়াদের তুমি কি মনে রাখো?

রোজ শুধু আঁচড় কাটে দিন
রাত মাখায় মলম নিজের মত
আকাশ কুসুম ছবি অন্তহীন
ভুলে যাওয়ার ব্যথা অন্তর্গত।

কালোর আলো জমকালো ঠিক যখন
তুমিও সাজো সবার চোখের মণি
আমিও তলোয়ার বেদুইন তখন
নিজের মনে কলম প্রতিধ্বনি।

চলে যাওয়ার কথায় দু:খ থাকে
ঠিক ভুল ছবি ঘুম চোখে তুমি আঁকো
সব কথা রেখেছি ছন্দ পাঁকে
ভুলে যাওয়াদের তুমি কি মনে রাখো?

The yearning

Jayasree Basu

Words get stuck.
I squeeze my heart
To utter those words
But as light as feathers
They float away further
Like a heavy water laden cloud
I ache. Thoughts travel to and fro
Imagination bites me sharply
Habits make me laugh and cry
Waking up at midnight
I search for words to be said
Where is my expression or where is
The note that is never lost or destroyed
That is nurtured deep within
How do I give them shape,
How do I free them up?

Chapters

Jayasree Basu

Life meets its different landmarks
Without much preparation forward,
Fears overwhelm minds
To face the unknowns
Until suddenly the path opens up,
Just as night turns into a day
Just as winter follows the summer
Just as a year turns into another
Just as each dawn seems different
So is Life’s music, ceaselessly
Playing different melodies
Across chapters of life
Each tune distinct and special with
Its own rhymes and rhythms.

ফাগু চা বাগানে এক রাত

মৌসুমী মোহারার

ফাগু পৌঁছলাম গ্যাংটক থেকে সন্ধ্যার কাছাকাছি সময়। সময়টা জুন মাস ২০১৫। কলকাতা যখন গ্রীষ্মের দাবদাহে দগ্ধ, হিমালয়ের পাদদেশে এই অঞ্চলে তাপমাত্রা ভারী আরামদায়ক। গ্যাংটক থেকে যাত্রা পথের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্ণনা করার মতো ভাষা আমার নেই। পড়ন্ত সূর্য্যের মায়াবী আলো ব্রিটিশ রাজত্বের বাংলোটাকে এক আশ্চর্য্য রূপ দিয়েছিলো। চা বাগানের ছোট ছোট চা গাছ চারিদিকে আর এই বাংলো এ ক টিলার মাথায়। বাংলোর প্রতিটা ঘরের সিলিংএর উচ্চতা বেশ দীর্ঘ। প্রতিটা বেডরুম এ ফায়ার প্লেস এবং সংলগ্ন বাথরুম আছে । আর যেটা আমার সবচেয়ে প্রিয় সেটা হলো এক বিশাল বারান্দা। বারান্দা থেকে ডুয়ার্সের দৃশ্য অকল্পনীয়। সৌভাগ্যবশতঃ সে রাতে আমরাই শুধু সে বাংলোর অতিথি। এই বাংলোতে, বাংলো ম্যানেজার আমাদের দেখভাল করবেন। সেই পছন্দের বারান্দায় বসে চা ও স্ন্যাকস খাবার পর আমাদের ম্যানেজার কাম কুক রাত্রের মেনু আলোচনা করে রান্নার ব্যবস্থায় মন দিলেন। আমরা স্নান সেরে বাংলো বারান্দায় বসে আছি, দেখি, চার পাঁচ জন মানুষ বন্দুক নিয়ে উপস্থিত। কিছু বুঝতে না পেরে আমরা ম্যানেজারবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, তো উনি বললেন এঁরা আমাদের রাতে পাহারা দেবে। যদিও পশু না মানুষ কার থেকে আমাদের রক্ষা করার দায়িত্ব এঁদের, সেটা খুব পরিষ্কার নয়। রাতের খাবার পশ্চিমি কায়দায় পরিবেশন করা হলো। ম্যানেজার নিজের জীবনের গল্প বলে আমাদের খাবার সময় টা সুন্দরভাবে ভরে রাখলেন। সে রাতে পাহারাদারদের ওপর ভরসা রেখে সুন্দর ঘুম দিলাম। জেটল্যাগ থাকাতে বেশ ভোরে ঘুম ভেঙে গেলো। আমরা বেরোলাম আশপাশ একটু দেখতে। শামুক'এর চলা, কুকুর মোরগ ছাড়া আর কোনো জন্তু দেখিনি। পাহাড়ের ওপর দিকে এক মন্দির আছে। যে কয় ঘর অধিবাসী, তাদের চেহারা নেপালের অধিবাসীদের মতো। ফিরে এসে পছন্দের বারান্দায় বসে চা খেতে খেতে ডুয়ার্সের সূর্যোদয় উপভোগ করলাম। একটু পরে ব্রেকফাস্ট দেওয়া হোল। এবার আমাদের গুছিয়ে রওনা দিতে হবে কলকাতার দিকে।

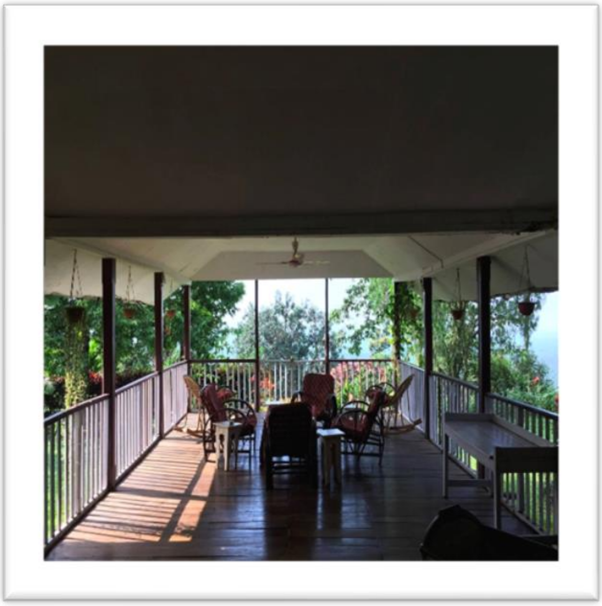

যাবার পথে চা প্রসেসিং প্লান্ট এ বেশ কিছু শিখলাম। অনেকটা যাত্রা পথ চা বাগানের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় টুকরি মাথায় চা বাগানের মহিলাদের দৃশ্য বহু বাংলা ছায়াছবির কথা মনে করাল। ডুয়ার্সের মনোরম চা বাগান কে পিছনে ফেলে বাগডোগরা বিমান বন্দরে পৌঁছলাম। কলকাতার ফিরতে হবে যে , কিন্তু ডুয়ার্সের সেই রাত এবং bungalow সারাজীবন মনে থাকবে। এই অভিজ্ঞতা বড়ই বিশিষ্ট।

প্লাবন

নমিতা কুন্ডু

বিধ্বংসী প্লাবনের জল বাড়ছে তো বাড়ছেই-
সেই ভয়ংকর জলোচ্ছ্বাসে
লন্ডভন্ড হয়ে গেল সাজানো শহর।
ভেঙে চুরমার হয়ে গেল কত বাড়ীঘর,
পথঘাট, গাছপালা।
তিল তিল করে গড়ে ওঠা সুন্দর নগরী
পরিণত হোল ধ্বংসস্তুপে।
ভেসে গেল কত মানুষ প্লাবনের জলে।
কত মানুষ হোল বাস্তুহারা,
কত স্বপ্নের হল অকাল মৃত্যু।

সবই কি তাহলে শেষ?
কিছুই কি হয়নি শুরু?
হয়েছে বৈকি-
নিঃস্ব, রিক্ত, বাস্তুহারাদের
কূলকিনারাহীন অনন্ত চিন্তার!

স্বামী বিবেকানন্দ

নমিতা কুন্ডু

তুমি গৈরিক বীর বিবেকানন্দ
এলে স্বামীজী ধরাতে।
তোমার প্রেমের বাণী, জ্ঞানের বাণী
হল প্রচারিত জগতে।

শ্রী রামকৃষ্ণ নির্দেশিত
পথ নিয়েছিলে জীবনে ব্রত,
সেই পথ ধরে গেলে তুমি চলে
শিকাগো ধর্ম সভাতে।

এল নিবেদিতা এই পথ ধরে
নিবেদিল প্রাণ ভারতের তরে।
জ্ঞানের আলো দেখে নারী জাতি
তোমারি অশেষ কৃপাতে।

আত্মকল্প

নন্দিতা দাশগুপ্ত

নিজের নিন্দেতে যখন নিজের্ই কান পাতা দায়
বৃত্তের মধ্যে থেকেও তখন বৃত্তের বাইরে গিয়ে দাঁড়াই।
সন্ধানী দৃষ্টিতে নিজেকে জরিপ করি বারবার
খুঁজে নিতে পারি যদি দোষত্রুটি,
সাফল্য-ব্যর্থতা আমার।
মগ্ন বিজ্ঞানীর মত
অণুবীক্ষণে দেখি
সবটুকু ভালো মন্দ খুঁত,
ছিদ্রে ভরা আজকের পরিচয় ধুয়ে মুছে দিয়ে
নির্মাণ করতে চাই অবয়ব নিখুঁত।
খুঁজে নেব মূলধন।
তোমাদের সবার জীবন
আমার প্রশ্বাসে বিশ্বাসে
অনিবার ছুঁয়ে আছে
ভরিয়ে তুলেছে এক অনন্য সুগন্ধে, সুবাসে।
তার থেকে ছেনে নিই যদি
একমুঠো শিউলির সুবাস
জ্বেলে যদি দেয় জ্যোতি
তোমাদেরই আলোর উদ্ভাস।
তবেই তো রচিত হয় আদর্শ পূর্ণ প্রতিকৃতি
উন্মুখ মন জানতে চায়
তখনও কি দেবে না স্বীকৃতি ?

যাত্রা

নন্দিতা দাশগুপ্ত

সূর্যোদয়ে যাত্রা শুরু
প্রভাতবেলা মেদুর রোদ্দুর
একা আমি চলেছি দিকশুন্যপুর।
আমাকে জড়িয়ে আছে অফুরান নীল
বুকে নাছোড়বান্দা স্বপ্নের মিছিল।
অতঃপর উত্তপ্ত দিন, ক্লান্তি আর ঘাম
সহসা বৃষ্টি নামে, স্নিগ্ধ পরিণাম।
এভাবে বিকেল গড়ায়, সন্ধ্যা নামে এসে
বহু ক্রোশ পাড়ি দিয়ে আসি পথের শেষে।
অনেক ধন অনেক মান ঝুলিতে সংগ্রহ
তারি সাথে ওতপ্রোত
দুঃখ সুখ হতাশা নিগ্রহ।
সারা দিনের পথশ্রমের পর
ভাবি বুঝি পৌঁছে গেলাম ঘর।
তাকিয়ে দেখি ঘর তো নয়, ভগ্নমনোরথ
জ্যোৎস্নার পথ বেয়ে ওই দুয়ারে প্রস্তুত রথ !

আবার হবে যাত্রা শুরু, এবার নতুন ঢঙের
খালি করতে হবে ঝুলি
প্রয়োজন নেই রঙের।
শূন্য হাতে সফেদ মনে কাটিয়ে মিছের মায়া
অনির্দেশের খোঁজে যাব জগতে আবছায়া ।।

A Personal Statement of Geography Dept. Presidency College (CU), Kolkata

Ranjana Khan

The College Street side bookstores, crowded buses and wide stairwell to Geography Department of Presidency College were foreign to me at the beginning. After three weeks, I felt more comfortable in the college. With a bag full of books from departmental library, I navigated to a bus stop, paid the fare, and began the trip back to my father's house at Bangur Avenue. It was hard to believe that only a few years earlier my mother was worried about letting me travel around Kolkata and attend a different school across the city. While I had been on a journey towards self-sufficiency and independence at the age of sixteen, it was Presidency College that pushed me to become the confident, self-reflective person that I am today.

I attended Presidency College from 1972-1975 and the final result came out during August of 1976. During that time the Geography department was steered by Dr. Amiya Banerjee. Commonwealth Scholarship holder Pradip Kumar Mukhopadhyay taught us Industrial planning, Statistics and Professor P. Roy taught us Cartography with some basic high-level mathematics. I must need to respectfully admit that the instruction I received from these professors, helped me to take challenge for engineering education in the USA and complete my undergraduate degree in Electrical/Computer Engineering with Mathematics major. Dr. Subhas Ranjan Bose taught us how to write pertinent description about Hydrology and dam construction.

The United Kingdom educated Dr. Amiya Banerjee indicated the relation of Human Geography with sociology. Currently, the World Bank Group is keenly interested in Sociology majors for the development of this distressed world.

I came in the USA during March of 1977 and realized at the age of twenty-one that the Geography curriculum for undergraduate level was wide-ranging which included Climatology and Soil Science. The professors of the Geography department taught us basic Physics and Chemistry to understand the Soil Science and technological basics of the Iron and Steel Industry. The method of instruction of these professors made me realize that becoming independent was a process, not an event.

The US corporate world is ever changing and has high expectations. Pradip Mukhopadhyay taught us about the US corporate landscape with the example of IBM. In Presidency College we felt pressured and stressed about meeting the expectations of the renowned professors. Similarly, the pressure our professors had put on us as a teen was of their devotion to learning and hopes for us, it was their desire to build our individuality. I try to approach every corporate experience with the expectation that it will change me. Working life is a time series, but I understand that just because growth can be uncomfortable does not mean it is not important.

অমৃত লোভায়

শুক্লা গাঙ্গুলি

মন বাউল দিনশেষে মাধুকরীতে
মহা ভিক্ষু দাও অহংকার ভিক্ষা
সুদীর্ঘ তাপদাহ শেষে মৃদু মন্থর বাতাসে
থাকুক আমন্ত্রণ ভালোবাসার-

যেন মেলে সে
পূর্ণ কলস অতল অপার
চমক জাগায় অমৃত লোভায়
ভোরের শিশির-

ঝুলি বুঝি পূর্ণ এবার - মানস লতায়

ভবতি ভিক্ষাং দেহী
মহা-অমৃত ভিক্ষাং দেহী-

শান্তি শান্তি- সর্ব্বৈ শান্তি।।

কৃষ্ণজীবন, পটল, এবং স্বনির্ভর গ্রাম

সোমনাথ বক্সী

“সাইকেলের দোকানের কাছাকাছি আসতেই পটল একজন নতুন মানুষকে দেখতে পেল। জলকাদা মাখা মানুষ, ...”

আধুনিক বাংলার মহাভারত বলতে যে বইটিকে বুঝি, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সেই ‘পার্থিব’ উপন্যাসের যে অধ্যায়টি আমার সবচাইতে প্রিয়, তারই দুটি লাইন। অনেকদিন বাদে গ্রামে ফিরছে কৃষ্ণজীবন। বিষ্ণুচরণের বড়ছেলে। হঠাৎ পথে দেখা বিষ্ণুচরণেরই ছোটছেলে রামজীবনের বড়ছেলে পটলের সাথে। রামজীবনকেই খুঁজতে বেরিয়েছে সে।

জলকাদা মাখা এই বড়জ্যাঠার সাথে এই প্রথম ভালোভাবে পরিচয় পটলের। বিশাল এক প্রাচীন অশ্বত্থগাছের মতো জ্যাঠা তার। ঠিক তেমনটাই গভীর তার শিকড়। ছোটবেলার গ্রাম, তার দেশ, এবং এই পৃথিবীকে গভীরভাবে ভালোবাসে কৃষ্ণজীবন। পটলকেও সেই ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধে সম্পৃক্ত করে সে। পন্ডিত আম্বেদকরের কথা শেখায় তাকে। বোঝায় কিভাবে আগে গ্রামগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। কিভাবে ইংরেজ আসার পর দেশের অর্থনীতির সাথে গ্রামের যোগাযোগ দুর্বল হলো। দেশের এবং বিলেতের বড় বড় কলকারখানার সামনে দুর্বল কামার তাঁতিদের কিভাবে হার হলো। বিরাট দেশের অর্থনীতির সামনে কিভাবে ছোট্ট গ্রামখানা একসময় হেরে গেলো, হারিয়ে গেলো। কি সুন্দর সরল অথচ গভীর সেই আলোচনা।

বিরাট দেশের অর্থনীতির সামনে আজ আমাদের গ্রামগুলি আরো দুর্বল এবং তুচ্ছ। গ্রামের অসহায় মানুষ সেই সহায়তার খোঁজে শহরে গিয়ে আরো বিপন্ন। ‘স্বাধীনতা’ এবং ‘আত্মনির্ভরতার’ কথা ভাবতে গিয়ে ‘পার্থিব’-র এই অংশটি এবং আমার ছোটবেলায় দেখা গ্রামগুলির কথা মনে পড়ছিলো। তেমনই একটি গ্রামের কথা বলবো আজ।

বসিরহাটের এক গ্রামে আমার দাদুর জন্ম। মায়ের বাবা। ছোটবেলায় মাঝে মাঝেই সেই গ্রামে যেতাম আমরা। মোসলন্দপুরে ট্রেন থেকে নেমে কিছুটা ট্রেকার-এ গিয়ে আর কিছুটা ভ্যানগাড়িতে বসে গ্রামে পৌঁছতে হতো। বড় রাস্তা থেকে বেশ কয়েকমাইল ভেতরে সেই গ্রাম। গ্রামে ঢোকার মুখের স্বাস্থকেন্দ্রর বাড়িটা দেখেই প্রতিবার চিনতে পারতাম এসে গিয়েছি। গ্রামের একটা প্রাইমারি স্কুল আর একটা হাই স্কুল ছিল। আমরা যার বাড়িতে উঠতাম সেই মামা ছিলেন ওই প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার। মামার সেই বাড়িতে ভ্যান গিয়ে দাঁড়াতো উঠোনের সামনে। উঠোনের বামদিকে বড় একটা ফণীমনসার গাছ। তার নিচে মনসার বেদি। শুনেছিলাম বড্ডো সাপের ভয় ওদিকে। মনসাবেদির পাশেই কয়েকটা ধাপ, পুকুরে নামবার জন্য। পুকুরপাড় ধরে কাঁঠাল গাছের সারি। সেই কাঁঠাল গাছের সারি আর ডানদিকের ধানের গোলার মধ্যে দিয়ে উঠোনের রাস্তা ধরে বাড়িতে ঢুকতে হতো। মামাদের নিজেদের ক্ষেতের আনাজ দিয়েই রান্না সবজি, আর পুকুরের মাছ দিয়ে গ্রামের চালের ভাত খেয়ে অনাবিল তৃপ্তি পেতাম আমরা। দুপুর কাটতো অলস ঘুমে।

বিকেলে মাঠে হাঁটতে বেরিয়ে কখনো ক্ষেতের শশা তুলে খেতাম। স্কুল থেকে ফিরছে তখন ছাত্রছাত্রীদের দল। মা আমাকে নিয়ে কখনো যেতেন কাছের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। ওখানকার কিছু লোককে চিনতেন মা, তাদের এবং স্বাস্থকেন্দ্রের কাজকর্মের খোঁজখবর নিতেন। মামার একমাত্র মেয়ে গ্রামের সমবায় সমিতিতে কাজ করতো। বাড়ি ফেরার পথে তার ওখানে দাড়িয়ে কিছুক্ষন কথাবার্তা হতো। বাড়ি ফিরে চিড়ে ভাজা কিংবা মুড়ি খেতে খেতে

বাবা আর ওখানকার লোকজনের রাজনীতি কিংবা অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা শুনতাম আমরা। সারাদিনের কাজের শেষে একে একে এসে জড়ো হতো সবাই। রোয়াক ভর্তি হয়ে গেলে নিকোনো উঠোনেই বসে পড়তো কেউ কেউ। মাঝে মাঝে একটা থালায় বেশ কিছু চায়ের কাপ নিয়ে সবার মাঝে বিলিয়ে দিয়ে যেতেন আমার মামিমা। পড়ন্ত আলো আর ধূমায়িত চায়ের মাঝে আলোচনা জমে উঠতো।

সন্ধ্যের দিকে আমরা যেতাম গ্রামের হাটের দিকে। বিশেষ কদর ছিল ওখানকার তৈরী গামছার। আমার বাবা-মা প্রতিবারই একটা কি দুটো কিনতেন। শাড়ি লুঙ্গিরও দোকান ছিল। শীতকালের দিকে এই হাটে গেলে গ্রামের তৈরী খেজুর-রসের গুড় বেসাতি বসে যেত। আমার সেই মামার বাড়িতেও গুড় জ্বাল দেওয়া হতো। জ্বাল দেওয়ার আগেরদিন সন্ধ্যেবেলা এবং সেইদিন ভোরবেলার নামানো রসের হাড়িগুলো এনে জড়ো করা হতো বাড়ির পিছনের উঠানের দিকে, যেদিকে রান্না ঘর। সেই উঠোনের মাঝে মাটিতে কেটে বানানো উনুনের উপর বসানো নৌকোয় জ্বাল দেওয়া হতো সেই রস। তার থেকে তৈরী হতো সুগন্ধী গুড়। সেই গুড়ই যেত হাটে। আমরা নিজেরাও নিয়ে আসতাম বাড়িতে। আর পাওয়া যেত আখের গুড়। মাটির হাড়ি-কলসি, বেতের বোনা ধামা কুলো, ঝাঁঝরি, কড়াই, খুন্তি-হাতার দোকানও ছিল।

গ্রামেরই কামার-শালার পাশ দিয়ে যখন রাতে বাড়ি ফিরতাম, দেখতাম কামার-এর দোকানে তপ্ত আগুনের মাঝে লোহা পেটানো চলছে, আর সেই আগুনের আঁচে বসেই শীত কাটাচ্ছেন কিছু হাটফেরত মানুষ।

গ্রামের মুলরাস্তার থেকে মাঠের দিকে যেতে হয় যে গলি ধরে, তারই ধারে একবাড়িতে কুমোরের কাজ দেখতে দাঁড়িয়ে পড়েছি বেশ কয়েকবার। ঘুরন্ত চাকার উপর মাটির দলা নিপুণ হাতের কারসাজিতে কিভাবে একের পর এক আকার ধারণ করছে তা দেখলে সত্যি এক জাদুর মায়ায় পেয়ে বসতো আমায়। তার পাশের বাড়িতেই আমার দাদুর এক ভাই থাকতেন। তার বাড়িতে গিয়ে তার নিজের হাতে জাল-বোনা দেখতেও তেমনটাই ভালো লাগতো। এই জালেই ধরা পুকুরের কি নদীর মাছ, গ্রামেরই কুমোর-কামারের তৈরী মাটির হাড়ি আর লোহার খুন্তির ছোঁয়া পেয়ে গ্রামের পাতে আসতো। এই জালের মতোই নিপুণ এক বুননে বোনা ছিল স্বনির্ভর গ্রামগুলির মধ্যেকার মানুষের একে ওপরের উপর নির্ভরতা। খাদ্য, শিক্ষা, এবং স্বাস্থ্য - জীবনের এই তিনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও ব্যবস্থা ছিল গ্রামেই, শহরের দিকে তাকিয়ে উতলা হতে হতো না। সেই আত্মনির্ভরতার অভাবই আজ গ্রামগুলিকে ও তার মানুষগুলিকে বড় কাতর করে তুলেছে বলে মনে হয়। তাকে ফিরিয়ে আনা গেলে বড় ভালো হতো।

Could We Live to a Hundred and still Enjoy a Creative Life?

Urmila and Mrinal K. Dewanjee

Summary The rationale for our daily consumption of foods is guided by the requirement of essential nutrients, vitamins and minerals for daily replacement of the ~100 billion dying cells in an adult human being having 30-40 trillion cells and weighing ~70 kg. The requirement of our daily food intake changes drastically from conception to rapid fetal growth in the uterus. The requirement is also different in adolescence and adulthood and declines significantly in geriatric ages. The bottleneck which regulates our food intake also directly regulates the retention of Body Mass Index (BMI) at 25-28 level and the patency of the lumen of three major coronary arteries at ~50-60% at the age of 75-80 years. We lose the precious space for coronary circulation due to focal or diffuse deposition of cholesterol plaque. This causes high shearing tear around stenosis, platelet deposition and calcification of platelet thrombus on the walls of narrow artery (~2-3 mm), which is even narrower in the Asian men and women. After ~70% loss of coronary space, we feel chest pain after exertion or walking up stairs. At old age (~70), we must work hard to maintain the pre-diabetic stage of the glycated hemoglobin (HemoglobinA1 C) to below 6%, the LDL-Cholesterol level at 70-80 mg/dL, triglyceride at 150 mg/dL and blood pressure at the pre-hypertensive level (systole: 100-120 mm, diastole: 60-70 mm) mainly by reducing food intake and daily exercise (treadmill: 25-30 min, exercise bike: 20-30 min and stretching: 15-20 min). The exercise also strengthens limb, back and abdominal muscles.

Since our weakened knees do not permit vigorous exercise, we lose only about 100-120 calories a day with reduced exercise. These forces us to limit our daily food intake from protein (~55-70 g), fats (~65-75 g) and complex carbohydrates (~120-140 g) to a total of 1500-2000 calories. Unless we inherit serious genetic diseases, we may live to a hundred with a disciplined lifestyle and enjoy a quality life.

Introduction Food ingredients that end up in a delicious meal, behave as a two-edged sword, depending on how they are processed (using fat-free, low-fat or a blend of saturated fats and cholesterol), and on their portion size. We need about 30 mg/dL of LDL-cholesterol in our blood. However, most of us have much higher level of 70-150 mg/dL. We could control it by eating fewer red meat (beef, pork, mutton, goat), less ghee or coconut or palm oil which have saturated fatty acids, and by taking statin drugs. Fortunately, the cholesterol deposition is reversible and could be reduced by adjusting the quality and quantity of food intake. However, our liver also synthesizes cholesterol, a concern particularly for the non-vegetarians.

Before we reach 60s and 70s, we do not give much attention to the daily food-platter. We eat as much as we like, till we feel the satiety, characterized by the absence of hunger, which follows at the end of a big meal of proteins and fats and the accompanying gastric stretching. These factors serve as food-meter in our brains mediated via the vagal nerve fibers of the gastrointestinal tract (GI tract). Two hormones related to the energy homeostasis leads to sensations of appetite and satiety: They are ghrelin (when blood sugar level is low) and leptin (when fullness is sensed). A shift in the delicate balance between ghrelin and leptin drastically affects our body's ability to regulate energy demands and storage, leading to pathophysiology of the complex metabolic syndrome.

As we finished writing two books recently, we realized about the deeper connection between excessive intake of low-quality, nutrition-poor and calorie-rich foods in one hand and the chronic diseases: obesity, diabetes, heart attack and stroke on the

other (1, 2). These interconnected issues are described in Figure 1, where, as cooks, we want the make the food delicious so that we can eat to our heart's desire and at the same time, we also must press the brake on food-intake. This is needed to avoid the seminal issue of chest pain from the coronary arteries, which gets into a vicious downward spiral of complete stenosis from cholesterol plaque, calcium-phosphate deposition, and platelet thrombus from ruptured plaque. CT Angiography easily identifies the loss of coronary space from the pathological entities. Long term research suggests that we can ingest sufficient carbs, fats and proteins daily and still maintain a BMI of 25-28. These considerations necessitate that we keep track of the daily intake of number of nutritious meals and alcoholic drinks, when we shop, cook and serve meals (4-6, 10-16).

Foods for a Balanced Meal come from vegetables, fruits, carbohydrates, fats and meat with essential vitamins, minerals and antioxidants. For majority of the people in India, vegetables, pulses, and grains are the main source of their daily diets, supplemented by dairy, eggs, fish or meat to provide a nutritionally balanced meal.

Carbohydrates come from many grains. The plant growth and development are regulated by many transcription factors that affect the expression of large sets of genes and activate subordinate transcription factors. Chinese scientists, Wei et al., increased the photosynthetic capacity and yields of rice and wheat that increased their yields from 40 to 68% in a shorter time using lower nitrogen fertilizer that also reduces the cost of production (11). Humans have domesticated ~12,000 species of the cultivated grasses for foods, animal feeds, beverages and construction materials (bamboos) for over millennia in large parts of the world. McSteen and Kellogg (12) and Bai and Cotrufo (14), have reviewed the molecular, cellular, and developmental bases of soil carbon sink, grain yield and dispersal, and other traits that are essential for domestication. These depend on distinct genes, networks, and pathways in different crop species, reflecting the underlying genomic diversity. We anticipate advances in coming years would illuminate the ecological and economic success of the humble grasses, we so often ignore (7, 8). The endoderm of the seeds provides the carbohydrates and the germ-embryo gives rise to the cooking oil in corns and soybeans. Rice plants grown in the soaking water of the delta region of the Bay of Bengal imbibe and concentrate arsenate (0.1-0.4 mg/kg) in the leaves and in the outer layer of rice grains (higher in brown rice with more nutrients) and can induce cancer in many organs (skin, bladder, lung, liver, prostate) and other types of diseases. Repeated washings with tap water before cooking can reduce the arsenide level significantly.

Chicken, Beef, Lamb, Pork and Goatmeat. For feeding eight billion hungry mouths, significant plant research is carried out all over the world. Meats from animal husbandry are more expensive; it takes 15 g of corns to make one gram of meat. Ranching needs a big pasture and farmers in Brazil, Indonesia, and other parts of this planet are deforesting the rainforest and aggravating the loss of carbon-sink. Fecal waste and urine from live-stock produce methane and ammonia and increase in these greenhouse gases aggravate climate change by increasing atmospheric temperature. Recently, I did an experiment at home using Bengali's favorite, goatmeat. From 2.0 kg of goatmeat, we got only ~1120 g of meat, 630 g of bone and a thick cake of saturated fats, triglycerides and cholesterol. This killer cake could be easily removed by boiling the goatmeat pieces in a pressure cooker for 25 minutes with two cups of water, two tea-spoons of salt and garlic. Meat was deboned, the broth with floating fat droplets was collected and allowed to cool for 24 hours in the refrigerator. The fatty cake was easily removed and discarded. The collagen-rich broth could be added during cooking (1). It will be enough to fill up 700 coronary arteries (2 mm ID, 5 cm long) directly needing CABG surgery (3-6).

Miracles of Vegetables, Fruits and Fibers. Versatile vegetable dishes are usually served in a menu, as a second or middle dish, mainly in two styles, one with onion and one without onion. They are a rich source of vitamins, minerals and antioxidants and fibers. However, they must be washed and peeled to remove the skin, unless they are home-grown and pesticide-free.

Metabolic Dysfunction Syndrome Studies in Caucasians and Overlooked Populations: Asians, Blacks, Spaniards and Ignored Indigenous American Indians. Clinicians measure several parameters, e.g., an elevated waist circumference, high blood pressure, elevated fasting blood sugar, elevated triglyceride levels, and low high-density lipoprotein (HDL-C) cholesterol. With any three out of the five criteria, the risk of heart disease increases two-fold and the risk of diabetes fivefold than a person without these problems, mainly for the Caucasian population; these data are missing in the people of Africa, South Asia and other ancestries and no prediction of their risk score can be made now. Even a small inclusion of these people can provide clinically useful data of markers of cholesterol metabolism and thus reduce the risk factors of coronary disease, heart attack/failure, and stroke. In 2021, Graham, et al. studied 1.65 million people, 21% of these were of non-European ancestries (8), Blacks and the forgotten Menominee Indian Tribe. They identified 529 lipid molecules correlated with hypertension in White participants and approximately 137 in Black participants. In 2016, Sumner et al. tested HbA1c in a group of healthy African immigrants to compare the results to those of US-Caucasians, and found that when used on its own, HbA1c correlated with abnormal glucose levels in only about half the participants (8-10). Glycated albumin, studied in China and Japan — another biomarker for abnormal blood sugar previously studied in Asian populations also correlated with disease risk in only about half the group. But the combination of both biomarkers, HbA1c and glycated albumin, effectively predicted risk for about 80% of the study participants. More data acquisition and critical analyses will be essential for a better global healthcare of diverse population (4,5). Note that in the title instead of the commonly used "metabolic syndrome", I used "metabolic dysfunction syndrome", which I believe is a more appropriate descriptor. The parameters of metabolic dysfunction are stated in Table 1. I also included the DASH diet (8-16).

These biomarkers change depending on a person's lifestyle, e.g., diet, exercise habits, and many other cultural, socioeconomic, and environmental factors. Discrimination and racism result in different rates of disease through a range of mechanisms. Existing tests measure these parameters of global differences in metabolism.

A personal note During my (MKD) lifetime, volunteered in many research clinical projects at Mayo Clinic and NIH. The most useful one resulted from the participation in the five-year "Obesity Phenotyping Project", where I was confined annually for six days at the Clinical Center. I kept a diary of all foods, drinks and calculated the total calories consumed. I gave a lot of blood for analyses of many hormones, electrolytes, vitamins, blood counts and differential white counts. This is how, I found out I had deficiency of vitamin D (cholecalciferol, iron and L-thyroxine) and low platelet counts. I also spent a day in the metabolic chamber for the calculation of resting energy metabolism (REM) using exhaled carbon dioxide with a spectrophotometer, where my three meals are served through a trapdoor. During the 5-year period, my REM value decreased from 1350 to 1250 calorie from aging. Any extra calorie, I consume, I must burn by exercise and walking. I also wanted to measure the level of cholesterol deposition with CT-angiography. My open mouth was sprayed with three puffs of nitroglycerine for vasodilation. A 64-detector CT scanner (GE Signa) scanned my chest region in 30 seconds. The acquired cardiac slices were stacked together and the major coronary arteries are reconstructed and gave an me an estimate of 50-60% blockage of diffuse cholesterol buildup. Similar measurements

were made for the carotid arteries and blood flow patterns indicating the lower risk of cerebral stroke with echocardiography. During exercise-treadmill EKG test, there was an inversion of T-wave at higher stress level. My HbA1C increased from 5.6% to 6%, the borderline status of diabetes. I am now taking 500 mg of metformin (slow-release), 10 mg of Rosuvastatin along with 100 mg of coenzyme CoQ10 for reduction of leg spasm, 100 microgram of L-thyroxine, 25 mg of Losartan and 1000 IU of Vitamin D3. Potassium supplement with a banana reduces this leg muscle pain.

References

1.Dewanjee U. A Quest for Aromas, Flavors and Nutrients in Indian Recipe. Kindle Publishing, Inc. 2022, Chapter 13, Nutrition.

2. Dewanjee MK. Measuring and Imaging the Arterial Platelet Thrombus in Heart Attack and Stroke: Saving Lives with Drugs, Devices and Genetics. Chapter 1, Introduction, May 14, 2021. Amazon.com.

3. Bluestein D, Niu L, Schoephoerster RT, Dewanjee MK. Fluid mechanics of arterial stenosis: Relationship to the development of mural thrombus. Annals of Biomedical Engineering 25: 344-356, 1997.

4. Chiu JJ, Chien S. Effects of disturbed flow on vascular endothelium: Pathophysiological basis and clinical perspectives. Physiol Rev 91: 327-387, 2011.

5. Dewanjee MK. Measuring the Platelet Thrombus and Embolus in Myocardial Infarct and Stroke: Rapid Intervention with Drugs Devices and Genetics. June 5, 2019. Grand Rounds-Clinical Center, NIH Lipsett Auditorium.
https://videocast.nih.gov/summary.asp?Live=33212

6. Dewanjee MK. Soft Jelly Plug of Platelet-fibrin Thrombus in the Injured Artery Kills the Heart and Brain resulting in Death and Paralysis: Preventive Measures with Exercise, Diets and Drugs. NabaPatrika, November 2021.

7. What’s is On Your Plate? Smart Food Choices for HealthyLiving. NIA,NIH,Publ. # 11-7708. 2013.

8. Graham SE, Clarke SL, Wu KHH, et al. The power of genetic diversity in genome-wide association studies of lipids. Nature 600: 675 23/30 Dec 2021. DOI: 10.1038/s41586-021-04064.

9. Moore JX, Chaudhary N, Akinyemiju T, et al. Metabolic syndrome prevalence by race/ethnicity and sex in the United States, National Health and Nutrition Examination Survey, 1988–2012. Preventable Chronic Disease 14: E24, March 2017. DOI10.5888/pcd14.160287.

10. Madhusoodanan J. Searching for better biomarkers for metabolic syndrome. C&EN 14-17, June 20, 2022
DOI10.5888/pcd14.160287

11. Wei S, Li X, Lu Z, et al. A transcriptional regulator that boosts grain yields and shortens the growth duration of rice. Science 377: 1-10, eabi8455 (2022) 22 July 2022.

12. McSteen P and Kellogg EA. Molecular, cellular, and developmental foundations of grass diversity. Science 377,599–602, 5 August 2022.

13. Sumner AE, Duong MT, Aldana PC, et al. A1C combined with glycated albumin improves detection of prediabetes in Africans: The Africans in America study. Diabetes Care 39(2): 271-277, 2016. doi: 10.2337/dc15-1699. Epub 2015 Dec 17.

14. Bai Y and Cotrufo MF. Grassland soil carbon sequestration: Current understanding, challenges, and solutions. Science 377, 603–608, 2022.

15. Ludwig DS, et al. The carbohydrate-insulin model: a physiological perspective on the obesity pandemic. Am J Clin Nutrition 114: 1873-1885, 2021.

16. White CR, Alton LA, Bywater CL, et al. Metabolic scaling is the product of life-history optimization. Science 377: 1-6, 834–839, 2022.

Table 1. Characterization of the metabolic syndrome that identify the biomarkers affecting diabetes and heart attack. Courtesy of Madhusoodanan J. (10).

1. High LDL-cholesterol (>60 mg/dL)
2. Low LDL-cholesterol (<50 mg/dL for women and <40 mg/dL for men)
3. High triglycerides (>150 mg/dL)
4. High fasting blood glucose (>100 mg/dL)
5. High blood pressure (Systolic >130 or diastolic >85 of Hg)
6. High waist circumference (>88 cm for women and >102 cm for men)

Three criteria out of six could be trouble and intervention with diets and drugs will prevent morbidity. Prev Chronic Disease 2017. DOI:10.5888/pcd14.160287.

<u>DASH Diet: Eight Categories-2,000 calorie/Day/70 kg Person:</u>

I. Grains: 6 to 8 Servings/Day. One Serving: 1 Slice Bread, 1 oz Dry Cereal, or 1/2 Cup Cooked Cereal, Rice or Pasta.
II. Vegetables: 4 to 5 Servings/Day. One Serving: 1 Cup Raw leafy Green Vegetable, 1/2 Cup Cut-up Raw or Cooked Vegetables, or 1/2 Cup Vegetable Juice.
III. Fruits: 4 to 5 Servings/Day: One Serving: 1 Medium Fruit, 1/2 Cup Fresh, Frozen or Canned Fruit, or 1/2 Cup Fruit juice.
IV. Fat-Free or Low-Fat Dairy Products: 2 to 3 Servings/Day. One Serving: 1 Cup Milk or, or 1-1/2 oz Cheese or Yogurt.
V. Lean Meats, Poultry and Fish: Six 1-oz Servings or Fewer/Day. One Serving: 1 oz Cooked Meat, Poultry or Fish, or 1 Egg.
VI. Nuts, Seeds and Legumes/Week: 4 to 5 Servings. One Serving: 1/3 Cup Nuts, 2 Tablespoons Peanut Butter, 2 Tablespoons Seeds, or 1/2 Cup Cooked Legumes (Dried Beans or Peas).
VII. Fats and Oils: 2 to 3 Servings/Day. One Serving: 1 Teaspoon Soft Margarine, 1 Teaspoon Vegetable Oil, 1 Tablespoon Mayonnaise or 2 Tablespoons Salad Dressing.
VIII. Sweets and Added Sugars: 5 Servings or Fewer/Week. One Serving: 1 Tablespoon Sugar, Jelly or Jam, 1/2 Cup Sorbet, or 1 Cup Lemonade.
NB. Replace sugar with sugar-substitutes, e.g., Splenda, Stevia or Saccharin and reduce calorie Intake.

Calculation of BMI and Average Calorie Consumption/Day (CCD) at 70 years
BMI: Weight (kg)/[Height (cm)] 2 ; Ideal BMI: 25-28

Keto Diets need (10-20)% calorie from Proteins + 40 g of Carbs (5-10)% (200 calories)

+ Fats 120-130 g (55-70)%

Resting Energy Metabolism (REE): Energy consumed for functioning at rest. REE increases

1.5-1.7-fold by exercise.

Tips for Good Health: Plan your Daily Meals, Read the Food Labels, Strict Adherence to Eating and Exercise

Figure 1. Sensing the Aromas, Flavors and Nutrients in Taste Buds, present on the upper surface of Tongue and the Sensory Neurons of Olfactory Bulb projected to the frontal cortex of Human Brain. These volatile organic molecules after sauteing/frying in oil, enhance food intake and enhance dopamine release and a satiety factor in the brain. Glucose and fatty acids in the nutrients are converted into adenosine triphosphate (ATP, Chemical currency unit)

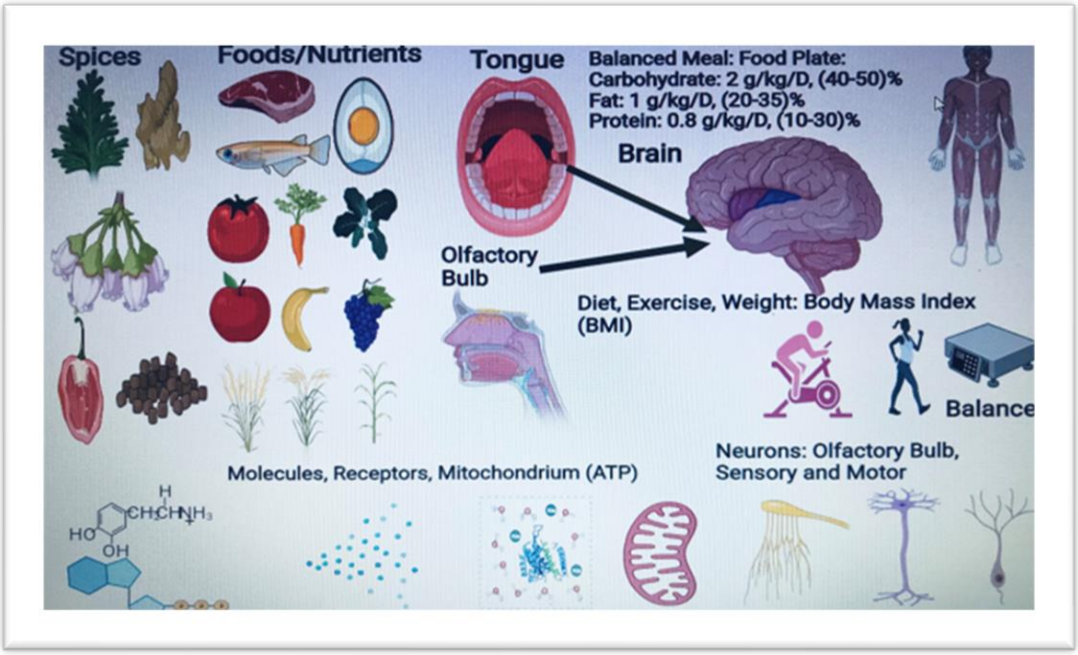

molecules in the mitochondria of all cells (~30 trillion in our human body holding ~100,000 trillion mitochondria) in all organs for running all the body functions. About two trillion mitochondria are made by fission in every second in the human body. One molecule of glucose generates 28 molecules of ATP by oxidative phosphorylation and only 2 molecules by glycolysis, mainly in cancer cells. Oxidation of the palmitic acid (16-Carbon saturated fatty acid) generates 131 molecules of ATP, a much higher level than that from glucose. The purpose of a balanced meal is to provide adequate daily calories (1500-2000) for maintaining a desirable BMI value below 25. These calorie intake numbers are lower for females and much higher in the athletes. Mitochondrial density decreases with age and causes degeneration of brain and other organs. Exercise, diet, fibers and drugs are necessary to control the appropriate weight. Saturated fat must be less than 10% of total fat intake; however, they also include cholesterol for making male and female hormones ((testosterone and estrogen, respectively). Recently, the food-intake chart has been modified from the food-pyramid to a food-plate considering the recent data on nutrition, BMI and longevity. The cartoon was designed using the BioRender software, licensed to NEI, NIH.

Figure 2 provides the simplistic dieting guidelines (1200-2000 Calories/Day) of Current Version of Daily Intake of Foods for the Dynamic Growth at Early Age, Plateau in the Middle Age and Decline at Older Age and Nourishment: Transition from the Food Pyramid old plan to a Food Plate. Courtesy of NIH, USDA: What's on Your Plate? (7)

Figure 3. Removal of the cholesterol-triglyceride rich floating white cake from goatmeat provides you with the Bengali delight without clogging your small arteries in the heart and brain. Courtesy of Dewanjee MK.

YOUR FRIEND.
YOUR NEIGHBORHOOD REALTOR®.

Nazir Ullah

The name you can trust with confidence.

Nazir Ullah gets the results that you want whether buying, selling, or investing in residential property.

LONG & FOSTER® REAL ESTATE

C: 301-537-9885
O: 301-424-0900
E: Nazir.Ullah@LongandFoster.com
W: NazirUllah.LNF.com

Top Producer | Multi-million Dollar Producer
Licensed in MD, VA, & DC | Over 20 Years Experience
Many Happy Clients!

Long & Foster Rockville Centre | 795 Rockville Pike | Rockville, MD 20852
If your property is currently listed with another broker, this is not intended as a solicitation.

INTERNATIONAL INSTITUTE OF INNOVATION AND TECHNOLOGY
AND
INTERNATIONAL UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH AND TECHNOLOGY
(UPCOMING)

FOUNDER-CHAIRMAN: DR. PRADIP K. GHOSH, COLUMBIA, MD

ADDRESS: DH-6/24, STREET : 0317, ACTION AREA- ID, NEWTOWN, KOLKATA- 700156.

WEBSITE: www.i3tk.org Phone: +91- 6292152210

INTERNATIONAL INSTITUTE OF INNOVATION AND TECHNOLOGY

MISSION: To improve public health in India by integrating research, education and health-related services that deliver innovative solutions to real problems impacting the society by creating and exploring the frontiers of research and education platforms.

PROGRAMS AT I3T:

1. JOHNS HOPKINS UNIVERSITY INDIA CENTER FOR MATERNAL AND CHILD HEALTH
2. INTERNATIONAL VACCINE ACCESS CENTER- VACCINE RESEARCH
3. INTERNATIONAL UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH AND TECHNOLOGIES
4. I3T ADVANCED DIAGNOSTIC CENTER
5. MARYLAND INTERNATIONAL STEM SCHOOL
6. RESEARCH DOMAINS:

• EPIDEMIOLOGY	• STEM CELL	• DIABETES
• BIOINFORMATICS • BIOSTATISTICS • BIG DATA	• MALARIA AND DENGUE	• BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY
• MICROBIOLOGY	• HEPATITIS • TYPHOID	• IMMUNOLOGY
• GENOMICS	• CANCER	• VIROLOGY

7. CENTER FOR MENTAL HEALTH
8. CENTER FOR ENTEPRENEURSHIP MANAGEMENT
9. CENTER FOR SOCIAL JUSTICE AND WOMEN EMPOWERMENT
10. BREAST CANCER RESEARCH CENTER
11. ENVIRONMENTAL HEALTH AND ENGINEERING CENTER
12. DEPARTMENT OF POPULATION, FAMILY AND REPRODUCTIVE HEALTH
13. RENEWABLE ENERGY RESEARCH CENTER

I3T LAB FACILITIES

INSTRUMENTATIONS: GENEXUS ION TORRENT, S5 PLUS NEXT GEN SEQ.), FACS, HPLC, LC-MS/MS, FPLC AND OTHER ADVANCED EQUIPMENT FACILITIES

UPCOMING:
I3T- MULTISPECIALITY HOSPITAL & I3T MEDICAL COLLEGE

INTERNATIONAL UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH AND TECHNOLOGY
(UPCOMING)

LOCATED ON 6.2 ACRES OF LAND IN NEWTOWN (800,000 SQ.FT. FLOOR SPACE CAMPUS- IN 8 SEPARATE BUILDINGS)

CENTER FOR SOCIAL JUSTICE, WOMEN EMPOWERMENT & OUTREACH

DONATED 350 OXYGEN CONCENTRATOR DISTRIBUTION DURING COVID-19, SAVED NUMEROUS LIVES

FOOD DISTRIBUTION DRIVE AND WOMEN EMPOWERMENT

HEALTH CAMP AT I3T ADVANCED DIAGNOSTIC CENTER

PUBLIC HEALTH / HEALTH SCIENCES/ TECHNOLOGY
AN INITIATIVE OF PRADIP AND KUMKUM GHOSH FAMILY FOUNDATION